আদিবাসী সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রভাব: হালুয়াঘাটের গারোদের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম .ফিল থিসিসের শর্ত পূরণার্থে দাখিলকৃত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
465120

465120

উপস্থাপনায়:
মো: আনিসুর রহমান
নিবন্ধন নম্বর :২৫১
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৩-২০০৪

তত্ত্বাবধায়ক:
অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এপ্রিল, ২০১১

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

465120

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

উৎসর্গ............

একজন সুহৃদ, একজন বন্ধু
হুমায়ুন ভাই যার

465120

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;২৫১ নিবন্ধন নম্বরধারী আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে “আদিবাসী সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবঃ হালুয়াঘাটের গারোদের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা” শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করেছে। অভিসন্দর্ভটি মৌলিক উপকরণ তথা মাঠ পর্যায়ে কর্মরত থেকে সংগৃহীত তথ্য সূত্র হতে প্রণীত এবং তার মৌলিক গবেষণার ফল। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল থিসিসের শর্ত পূরণার্থে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি জমাদেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হলো।

465120

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

M Hossain 30/4/11

তত্ত্বাবধায়কঃ
অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আদিবাসী গারোদের ধর্মীয় পরিচয় এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধে আধুনিক শিক্ষার সম্পর্ক নিরূপণ করা। গবেষণা এলাকা হিসাবে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার আসকিপাড়া এবং আইলাতলী গ্রামকে নির্বাচন করা হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে বিশেষণাত্মক পদ্ধতি (Qualitative Research Method) ব্যবহার করা হয়েছে।

এই গবেষণায় সমাজতাত্ত্বিকদের তত্ত্বের আলোকে গারোদের ধর্মান্তর প্রক্রিয়া এবং আধুনিক শিক্ষার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে, প্রাথমিক উৎস এবং দ্বিতীয় উৎসের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়।

প্রাথমিক উৎসের তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহের জন্য গবেষক সশরীরে হালুয়াঘাটের আসকিপাড়া এবং আইলাতলী গ্রামে গারোদের সাথে নিবিড়ভাবে মিশে অনাবদ্ধ ধরনের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে, ৩০ জন উত্তরদাতার নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় উৎসের তথ্যের জন্য ইন্টারনেট, বইপত্র, ম্যাগাজিন, প্রবন্ধ এবং পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণাপত্রের সহযোগিতা নেন। মাঠ পর্যায়ে গবেষক নভেম্বর, ২০১০ থেকে মার্চ, ২০১১-এর মধ্যে উল্লেখিত উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

ধর্মান্তরিত হওয়াটা ছিল গারোদের জন্য একেবারেই ভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা কেননা তারা তাদের নিজেস্ব পরিচয় হারিয়ে খ্রিস্টান হয়েছিল। খ্রিস্টান মিশনারীয়রা গারোদেরকে নতুন পরিচয় দিতে সক্ষম হয়।ধিরে ধিরে গারোরা তাদের অনেক মূল্যবোধ, প্রথা, বিশ্বাস, নিয়মনীতি, উৎসবকে পেছনে ফেলে খ্রিস্টানদের ঘরনার মধ্যে প্রবেশ করে। এতে করে আসলে তারা একই সাথে পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যেই প্রবেশ করে। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক এরকম দ্বৈতয়িক পরিবর্তনের জন্য তারা নিজেদের পরিচয়ের সংকট তৈরি করে। যার ফলাফল হচ্ছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ।

অন্য দিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বর্তমান সময়ের গারোরা তাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুণরায় পালনের মধ্যদিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক দেওলিয়াত্ব থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে যেটা হালুয়াঘাটের আসকিপাড়া গ্রামে গবেষক প্রত্যক্ষ করেন ।

এই গবেষণায় গবেষক কার্ল মার্কস্ এর alienation তত্ত্ব এবং মেলভিন সিম্যান এর বিচ্ছিন্নতাবোধ মডেলের পাচটি বৈশিষ্ট্যে এবং বর্ট্রান্ড রাসেলের আধুনিক শিক্ষাত্ত্বের মাধ্যমে গারোদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্লেষণে এবং গারোদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ ব্যখ্যা করেন । গবেষণার ফলাফলে গবেষক হালুয়াঘাটের গারো সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রভাব সরূপ সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যক্ষ করেন ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে কোনো গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা দুরূহ ব্যাপার। গবেষণার কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য অনেকেরই সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। গবেষণার মতো একটি সৃষ্টিশীল কর্মে বিভিন্নজনের নিকট নানাভাবে সাহায্য-সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি, তাঁদের সবার কাছেই আমি চিরকৃতজ্ঞ।

প্রথমেই, সার্বক্ষণিক তাগিদে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ এবং তত্ত্ব ও তথ্যের উৎসসমূহের সন্ধ্যানদানসহ যথাযথ নির্দেশনা ও গবেষণার যাবতীয় কাজ সম্পাদনে উৎসাহ, প্রেরণা ও সযত্ন তত্ত্বাবধান প্রদানের জন্যে আমি আমার গবেষণার তত্ত্ববধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন স্যারের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। এরকম একজন বিদগ্ধ অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে পেরে সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাই বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় ড. এ.আই.মাহবুব উদ্দিন আহমেদ স্যারকে যিনি আমাকে সুপরামর্শ প্রদান করে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করেছেন। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যলাভ আমার জীবনে পরম পাওয়া, যাঁকে মনের অজান্তে শ্রদ্ধাভরে অনুসরণ করি। গবেষণার কাজে এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট যে কোনো সময়ে তিনি তাঁর মূল্যবান সময় আমার জন্য ব্যয় করে চিরকৃতজ্ঞতার বাঁধনে আবদ্ধ করেছেন। বর্তমান গবেষণাকর্মে, তার অসীম জ্ঞান ও দিক নির্দেশনাদান আমার কাজকে সহজ ও ঠিকভাবে সম্পাদন করতে সহায়তা করেছে। বলতে গেলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে উচ্চমান ও মাপের গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় তার সাথে এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক ড.মাহবুবা নাসরীন ম্যাডাম গবেষণা চলাকালীন সময়ে বিভিন্নভাবে খোঁজ খবর নেওয়া, মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন।তার প্রতি বিনয়ের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এছাড়া যাদের কথা না বললেই নয়, আমার অত্যন্ত প্রিয় বাবু ভাই,মনির ভাই, হাতেম ভাই, কামরুল ভাই, হারুন ভাই এবং আমার বন্ধু সুমি,

মেঝবা, তনু,শতাব্দী কাদের এবং আমার সহপাঠী বন্ধু মেহেদি ভাই,সাইফুল ভাই, সারোয়ার ভাই এদর সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই; তাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা, সুপরামর্শ ছাড়া আমার এ কাজ সম্পন্ন করা কষ্টকর হয়ে যেত।

যে কোনো কর্মসম্পাদনের জন্য আমার সকল প্রেরণার উৎস আমার মা, বাবা, ভাই-বোন, ভাগ্নে, ভাগ্নী এবং বিল্লাল এদের সকলের গবেষণাকালীন সমসয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া, উৎসাহ ও সাহস প্রদান আমার পথ চলার-ই উৎস ও শক্তি, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভিসন্দর্ভ রচনায় প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের নানা গ্রন্থ আমি ব্যবহার করেছি। গবেষণা সম্পৃক্ত অধ্যয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, গণ গ্রন্থগার এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

সবশেষে বলতে চাই, গারো সম্প্রদায়ের সিমন দাদা,শিমুল দাদা, শত ব্যবস্তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাঝেও, কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে আমাকে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন; এছাড়া গারো সম্প্রদায়ের সকল মানুষ যারা আমাকে তাদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন তাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের সহযোগিতা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করাই সম্ভব হতো না।

শুভেচ্ছাসহ ধন্যবাদান্তে
সমাজবিজ্ঞান গবেষক।
মো: আনিসুর রহমান

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

সারসংক্ষেপ iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার vi
সূচিপত্র vii
সারণি তালিকা ৯৩-৯৭
মানচিত্র তালিকা ২-৪
আলোকচিত্র তালিকা ১১১-১১৪

প্রথম অধ্যায়ঃ

সূচনা

১.১ আদিবাসী গারোদের জীবন - সংস্কৃতি ও আধুনিক শিক্ষা: আন্তঃসম্পর্কের পটভূমি ৫
১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৮
১.৩ গবেষণা এলাকা পরিচিতি ও গ্রাম নির্বাচন ৮
১.৩.১ আসকিপাড়া গ্রাম ৯
১.৩.২ আইলাতলী গ্রাম ৯
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ১০
১.৫ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো, ধারণায়ন এবং সাহিত্য পর্যালোচনা
১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

আদিবাসী গারোদের ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

২.১ বাংলাদেশে গারোদের গোড়াপত্তন ২৫
২.১.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গারোদের আনুমানিক বসতি স্থাপনকাল ২৭
২.১.২ গারো নামকরণ ২৯
২.১.৩ দৈহিক গঠন ও সাধারণ স্বাস্থ্য ৩০
২.২ গারোদের সামাজিক কাঠামো ৩১
২.২.১ মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ৩৪
২.২.২ গারোদের পোষাক,খাদ্যাভ্যাস, নৃত্য, গান, লোক কাহিনী ৩৫

২.২.৩ গারোদের উৎসব সমূহ ৪০
২.৪ গারোদের অর্থনৈতিক কাঠামো ৪২
২.৪.১ গারোদের উত্তরাধিকার আইন ৪৩
২.৪.২ পেশা ৪৬

তৃতীয় অধ্যায়

গারোদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ

৩.১ আদিবাসী গারো সমাজের প্রাথমিক শিক্ষা চিত্র ৫১
৩.১.১ ভৌত কাঠামো ৫২
৩.১.২ সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ৫৩
৩.১.৩ বই প্রাপ্তি ৫৩
৩.১.৪ ঝরে পরা ৫৪
৩.১.৫ পারিবারিক শিক্ষা ব্যয় ৫৫
৩.১.৬ শিক্ষার মান ৫৫
৩.২ প্রান্তিক গারোদের শিক্ষার সুযোগ এবং সমস্যা ৫৭
৩.৩ যারা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচেছ ৫৯
৩.৪ আদিবাসী গারোদের শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয় ৬০
৩.৫ গারো সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রভাব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ ৬১
৩.৬ বিশ্লেষণ: গারো সমাজে আধুনিক শিক্ষা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ ৬২

চতুর্থ অধ্যায়

গারোদের আদি ধর্ম, ধর্মান্তর(খ্রিষ্ট ধর্মে রূপান্তর)প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক

৪.১ গারোদের আদি ধর্ম ৭১
৪.২ ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক ৭৯
৪.৩ ধর্মান্তর প্রক্রিয়া,খ্রিষ্টান মিশনারীয়দের কৌশল এবং গারোদের শিক্ষা গ্রহণ প্রয়াস ৮০
পঞ্চম অধ্যায় ৮৫

কেস স্টাডি এবং তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ও ফলাফল উপস্থাপন ৯৮
পরিশিষ্ট-১: তথ্যদাতার পরিচিতি ১০২
পরিশিষ্ট-২: প্রশ্নমালা ১০৬
গ্রন্থপঞ্জি ১০৮
পাদটীকা ১১০
আলোকচিত্র ১১১

প্রথম অধ্যায়

আদিবাসী গারোদের জীবন-সংস্কৃতি ও আধুনিক শিক্ষাঃ আন্তঃ সম্পর্কের পটভূমি

জেলাভিত্তিক বাংলাদেশের গারো জাতিসত্তা মানচিত্র

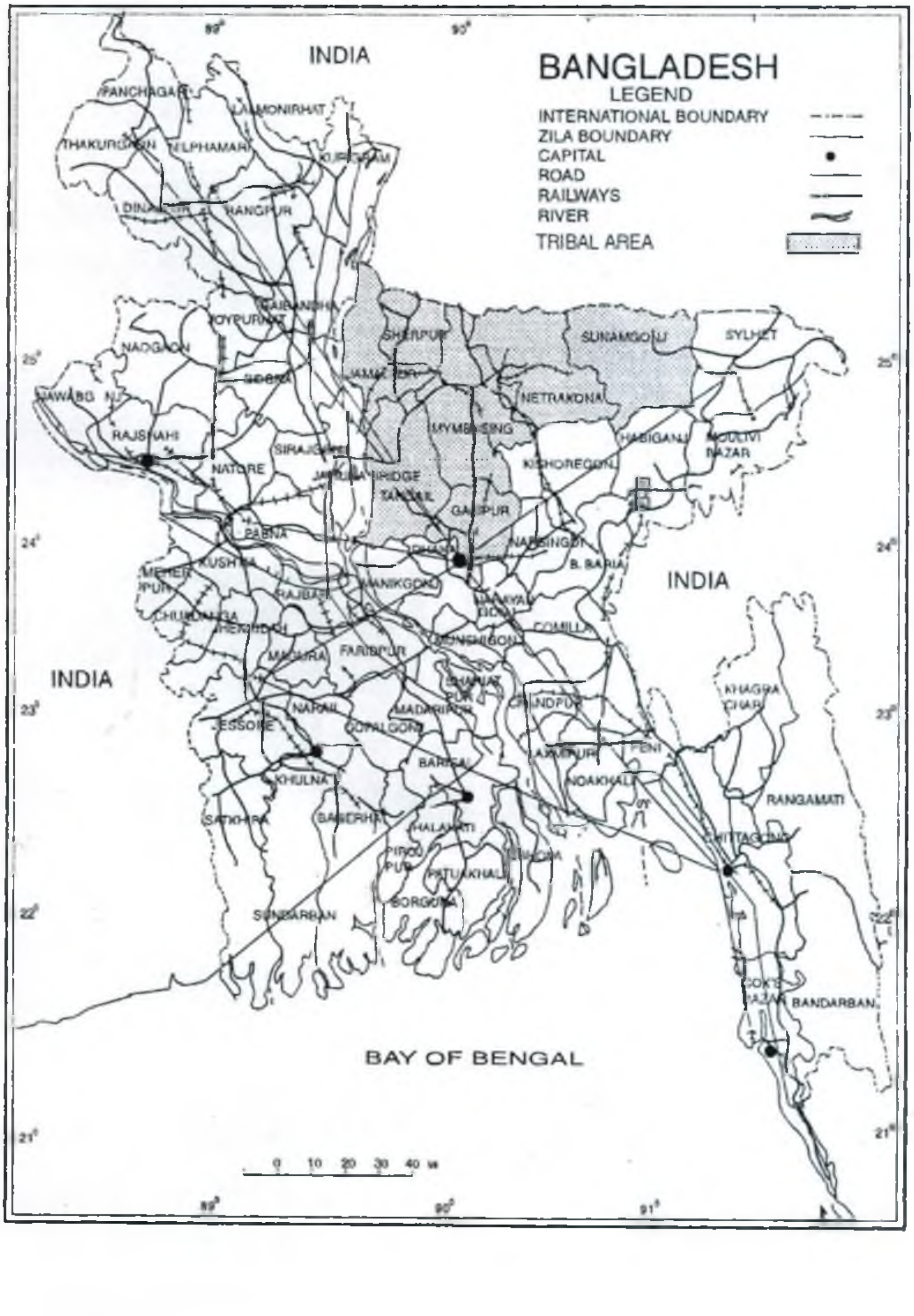
INDIA
BANGLADESH
LEGEND
INTERNATIONAL BOUNDARY
ZILA BOUNDARY
CAPITAL
ROAD
RAILWAYS
RIVER
TRIBAL AREA
PANCHAGAR
LALMONIRHAT
THAKURGAON
NILPHAMARI
KURIGRAM
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
NAOGAON
SHERPUR
SUNAMGONJ
SYLHET
BOGRA
JAMALPUR
NETRAKONA
NAWABGONJ
RAJSHAHI
MYMENSING
HABIGANJ
MOULVI BAZAR
SIRAJGONJ
NATORE
KISHOREGONJ
JAMUNA BRIDGE
TANGAIL
GAZIPUR
PABNA
NARSINGDI
DHAKA
B. BARIA
KUSHTIA
MEHERPUR
RAJBARI
MANIKGONJ
NARAYANGONJ
CHUADANGA
JHENIDAH
COMILLA
MUNSHIGONJ
MAGURA
FARIDPUR
SHARIATPUR
CHANDPUR
KHAGRACHARI
NARAIL
MADARIPUR
JESSORE
GOPALGONJ
LAXMIPUR
FENI
BARISAL
KHULNA
NOAKHALI
RANGAMATI
SATKHIRA
BAGERHAT
JHALAKATI
CHITTAGONG
PIROJPUR
PATUAKHALI
BHOLA
BORGUNA
SUNDARBAN
COX'S BAZAR
BANDARBAN
BAY OF BENGAL
89°
90°
91°
25°
24°
23°
22°
21°
0 10 20 30 40

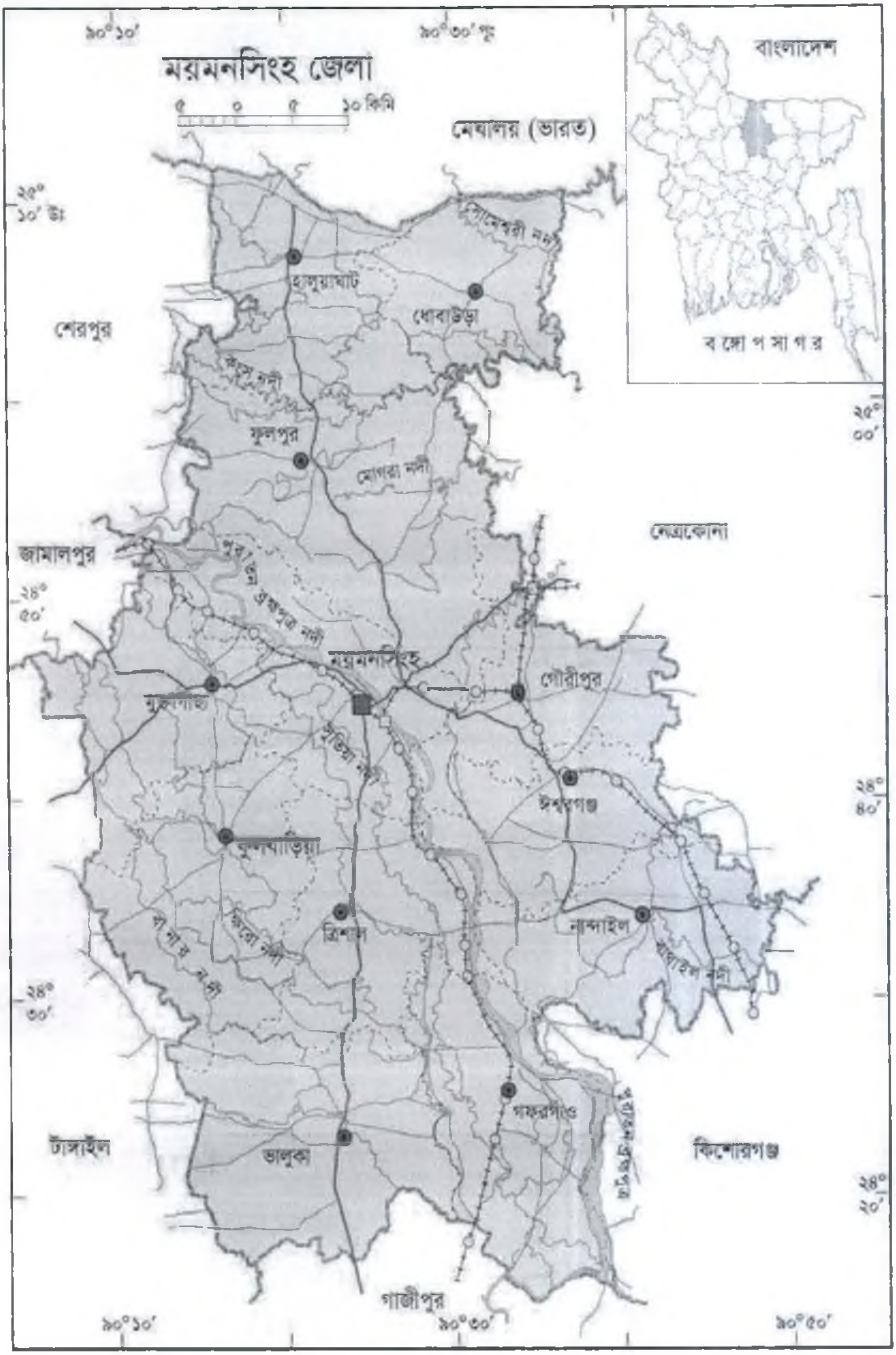
৯০°১০'
৯০°৩০' পূ
ময়মনসিংহ জেলা
৫ ০ ৫ ১০ কিমি
মেঘালয় (ভারত)
বাংলাদেশ
বঙ্গোপসাগর
২৫° ১০' উঃ
সোমেশ্বরী নদী
হালুয়াঘাট
ধোবাউড়া
শেরপুর
কংস নদী
ফুলপুর
২৫° ০০'
মোগরা নদী
নেত্রকোনা
জামালপুর
২৪° ৫০'
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী
ময়মনসিংহ
গৌরীপুর
মুক্তাগাছা
সুতিয়া নদী
ঈশ্বরগঞ্জ
২৪° ৪০'
ফুলবাড়িয়া
ত্রিশাল
নান্দাইল
খিরো নদী
বানার নদী
কাঁচামাটিয়া নদী
২৪° ৩০'
গফরগাঁও
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র
কিশোরগঞ্জ
টাঙ্গাইল
ভালুকা
২৪° ২০'
গাজীপুর
৯০°১০'
৯০°৩০'
৯০°৫০'

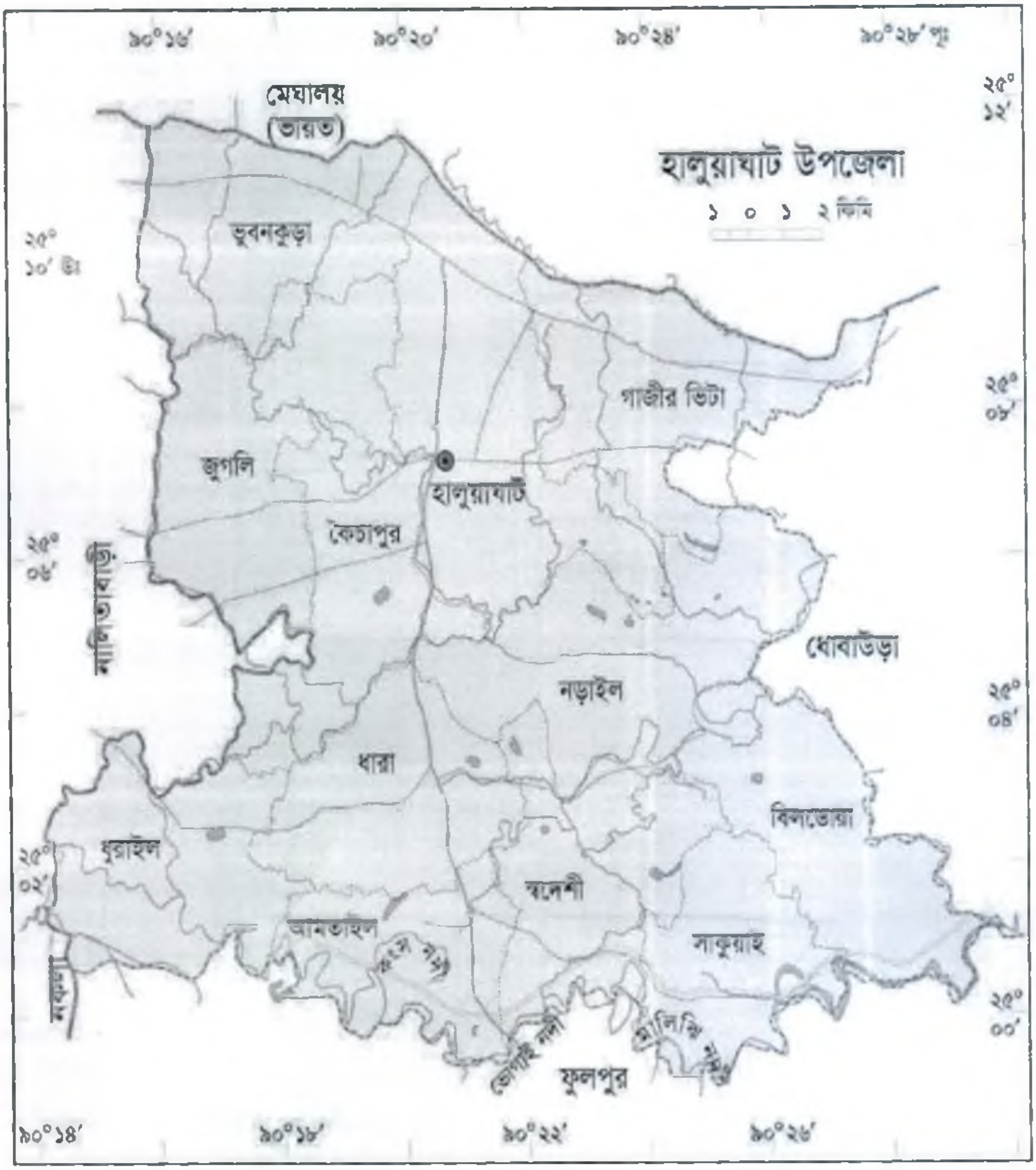
৯০°১৬′
৯০°২০′
৯০°২৪′
৯০°২৮′ পূঃ
মেঘালয়
(ভারত)
হালুয়াঘাট উপজেলা
১ ০ ১ ২ কিমি
২৫° ১২′
২৫° ১০′ উঃ
ভুবনকুড়া
গাজীর ভিটা
২৫° ০৮′
জুগলি
হালুয়াঘাট
কৈচাপুর
২৫° ০৬′
নালিতাবাড়ী
ধোবাউড়া
নড়াইল
২৫° ০৪′
ধারা
বিলডোরা
২৫° ০২′
ধুরাইল
স্বদেশী
আমতৈল
কংস নদী
সাকুয়াই
নকলা
২৫° ০০′
ভোগাই নদী
মালিঝি নদী
ফুলপুর
৯০°১৪′
৯০°১৮′
৯০°২২′
৯০°২৬′

প্রথম অধ্যায়

১.১ আদিবাসী গারোদের জীবন-সংস্কৃতি ও আধুনিক শিক্ষাঃ আন্তঃ সম্পর্কের পটভূমি

বাংলাদেশে বসবাসরত ২৯টি[১] আদিবাসী[২] জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য গারোরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে গারোরা ছিল আদিম প্রাক সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। তখনকার সাম্যবাদী গারো সমাজে পুঁথিগত শিক্ষা প্রচলিত ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ বিদ্যা ও শরীর চর্চা চলত। সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি মৌখিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। গারোদের মধ্যে পুঁথিগত শিক্ষার প্রচলন করেন বিদেশি খ্রিষ্টান মিশনারিগণ।[৩]

ধর্মান্তর, আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও পার্শ্ববর্তী সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার দরুণ গারোদের জীবনযাত্রা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু পরিবর্তন এসেছে। এই রকমভাবে সামাজিক পরিবর্তনের দরুণ গারোরা তাদের অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে

পক্ষান্তরে তারা নতুন কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। যার ফলে, সামাজিক পরিবেশ সৃষ্ট অস্তিত্ব থেকে গারোদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা দশা তৈরি হয়েছে। এই বিচ্ছিন্ন দশা মূলত একটি সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা। এই গবেষণা পত্রের মূল focus হচ্ছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার যে সম্পর্ক তা ব্যাখ্যা করা।

হালুয়াঘাট উপজেলায় দুটি গ্রাম আসকিপাড়া এবং আইলাতলীয় বসবাসরত আচিক* গারো পরিবারগুলোর মধ্য থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে গবেষণা পত্রটি করা হয়েছে।[৪]

বাংলাদেশে আদিবাসী জনসংখ্যা কত এবং বাংলাদেশে কয়টি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে, এ নিয়ে সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে। সরকারের হিসেবের সঙ্গে আদিবাসীদের তথ্যের ব্যবধান অনেক। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের মতে বাংলাদেশে ৪৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। আবার ১৯৯১ সালের লোকগণনায় বাংলাদেশ সরকার ২৯টি আদিবাসী সম্প্রদায় এবং 'অন্যান্য মিলে আদিবাসী জনসংখ্যা দেখিয়েছে ১২,০৫,৯৭৮ জন।

১৯৯১ সালের সরকারি আদমশুমারি অনুসারে আদিবাসীদের জনসংখ্যা নিম্নরূপ–

জাতিসত্তার নাম	জনসংখ্যা	জাতিসত্তার নাম	জনসংখ্যা
বংশি	২১১২	বম	৬৯৭৮
বুনা	১৩৯১৪	চাক	২০০০
চাকমা	২৫২৯৮৬	কোচ	১২৬৩১
গারো	৬৮২১০	হাজং	১১৪৭৭
হরিজন	৬৩	খাসিয়া	১৪৩১২
খেয়াং	২৩৪৫	খমই	১২৪১
লুসাই	৬৬২	মাহাত/মাহাতো	৩৫৩৪
মারমা	১৫৪২১৬	মণিপুরি	২৪৯০২
মুন্ডা/মুন্ডিয়া	২১১২	মুরাং	২২১৭৮
ম্রো	৩২১১	পাহাড়ি	১৮৫৩
পাংখো/পানকো	৩২২৭	রাজবংশী	৫৪৪৪
রাখাইন	১৬৯৩২	সাঁওতাল	২০২৭৪৪
তঞ্চঙ্গ্যা	২১০৫৭	তিপরা	১২৪২
ত্রিপুরা	৭৯৭৭২	উরাং	১১২৯৬
উরাও/উঁরওয়া/উরিয়া	২৪৮১	অন্যান্য	২৬১,৭৪৬
	মোট = ১,২০৫,৯৭৮		

এর মধ্যে গারো জনসংখ্যা উল্লেখ আছে ৬৮,২১০ জন এবং অন্যান্য তথ্য সূত্রে অনুমান করা হয় বর্তমানে গারো জনগোষ্ঠী হলো প্রায় ১,২০,০০০ থেকে ১,৩২০০০ এর মতো(ইনটারনেট)। গারোরা, গারো পাহারসহ ভারতের মেঘালয় রাজ্য ও গারো পাহাড় সংলগ্ন দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় বসবাস করে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর এবং সিলেট জেলার ভারতীয় সীমানা সংলগ্ন জায়গায় বসাবস করে।

১৯৭৯ সালের এক সরকারি জরীপে দেখা যায়, গারোদের ২০ ভাগের কোন নিজস্ব জমি নেই, ৩০ ভাগের কেবল থাকার ঘর আছে, ৩০ ভাগ দিন মজুর হিসেবে কাজ করে এবং ২০ ভাগ বর্গা চাষ করে।

গারোদের মাঝে সকলেই প্রায় দ্বি-ভাষিক কারণ তারা তাদের নিজস্ব ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায়ও কথা বলে। (Bal, Ellen: 1999)[৫] গারোদের নিজস্ব ভাষার নাম হলো 'আচিক ভাষা'। আচিক ভাষার নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। তবে গারোদের মধ্যে ৪জন ব্যক্তি আচিক বর্ণমালা উদ্ভাবন করেছেন এবং এগুলো নিয়ে গবেষণা কাজ চলছে।

গারোদের আদি ধর্ম হলো সাংসারেক যেটি এখন বিলুপ্ত প্রায়।[৬] বাংলাদেশের গারোদের শতকরা ৯৮ জনই বর্তমানে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান।[৭] খ্রিস্ট ধর্ম আগমনের পূর্বে কিছু সংখ্যক গারো হিন্দু ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে ছিল তাদের জলছত্র, বেয়ারারাঙ্গা, ভাকুয়ায় দেখা যায়।

গারো সংস্কৃতির অন্যতম অংগ হচ্ছে মাতৃতন্ত্র। তিনটি ভিত্তিমূলক প্রথাকে নিয়ে এই মাতৃতন্ত্র।

প্রথম: পুত্র কন্যাগণ হবে মাতৃ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, তারা মাতৃগোত্রের নাম গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয়: মাতৃতান্ত্রিক বিবাহ প্রথা।

তৃতীয়: মাতৃতান্ত্রিক সম্পত্তি প্রথা।

গারোদের মধ্যে প্রচলিত মাতৃতন্ত্র অনুযায়ী কোনো পুরুষ কোনো প্রকার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না। কিন্তু আধুনা শিক্ষিত গারোদের মধ্যে এই প্রথা ভাঙ্গার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

এর সবগুলো পরিবর্তনই মূলত: গারোদের সামষ্টিক মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতা দশার ইঙ্গিত বহ। এই গবেষণা কর্মে তারই ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হবে।

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

আমার এই গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, আদিবাসী গারোদের ধর্মীয় পরিচয় এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধে আধুনিক শিক্ষার সম্পর্ক নিরূপণ করা।

১.৩ গবেষণা এলাকা পরিচিতি এবং গ্রাম নির্বাচন:

আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হলো, আদিবাসী গারোদের উপর আধুনিক শিক্ষার প্রভাব : হালুয়াঘাটের গারোদের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা এবং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গারোদের ধর্মীয় পরিচয় ও সামাজিক রূপান্তরে আধুনিক শিক্ষার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। সেজন্য আমি গারো অধ্যুষিত হালুয়াঘাট উপজেলাকে[১১] গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করেছি। হালুয়াঘাট হচ্ছে ময়মনসিংহ জেলার একটি উপজেলা। এই উজেলার আয়তন ৩৫৬.০৭ বর্গ কি.মি.। উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে ফুলপুর উপজেলা, পূর্বে ধোবাউড়া উপজেলা, পশ্চিমে নালিতাবাড়ী উপজেলা। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২,৪২,৩৩৯ জন। স্থানীয় গারোদের তথ্যানুযায়ী আনুমানিক প্রায় ১০,০০০ গারো এই উপজেলায় বাস করে। এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহে গারোদের সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০ (বাংলাপিডিয়া)। হালুয়াঘাটের অনেক গ্রামেই গারোরা বসবাস করে। আমি আমার গবেষণায় আসকিপাড়া এবং আইলাতলী গ্রামকে গবেষণা গ্রাম হিসেবে নির্বাচন করেছি। গ্রাম

নির্বাচনের পূর্বে আমি কয়েকজন গারো এবং স্থানীয় বাঙ্গালীর সাথে কথা বলি এবং তাদের সার্বিক সহযোগিতায় আমি আমার গবেষণার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করি। এ ছাড়া ইন্টারনেট, বিভিন্ন পুস্তকাদির সহায়তায় হালুয়াঘাট সম্পর্কিত তথ্য পাই।

১.৩.১ আসকিপাড়া গ্রাম

ক. উপজেলা সদর থেকে আসকিপাড়া গ্রামের দূরত্ব প্রায় ৪ কি.মি.। গ্রামটি হালুয়াঘাটের ১নং ভুবনকুড়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। হালুঘাট উপজেলা সদর থেকে গ্রামটি পশ্চিম দিকে প্রায় চার কি.মি. দূরে অবস্থিত।

খ. আসকিপাড়া গ্রামে একটি জি.বি.সি[১২] চার্চ একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি জুনিয়র হাইস্কুল এবং একটি মিশনারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। স্কুলগুলোতে গারো এবং বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে লেখাপড়া করে।

গ. আসকিপাড়া গ্রামে গারো এবং বাঙ্গালীরা পাশাপাশি বসবসা করে।

ঘ. এই গ্রামে এখন পর্যপ্ত বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছেনি। দুই/একটি বাড়িতে জেনারেটর রয়েছে। তবে গ্রামটি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত।

ঙ. অনেকগুলো এন.জি.ও গ্রামটির দরিদ্রতা নিরসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করছে।

চ. গ্রামে একটি ছোট বাজার আছে।

ছ. এই গ্রামের গারোদের মধ্যে বর্তমানে সাংসারেক ধর্মের অনুসারী কাউকে পাওয়া যায়নি। সকলেই ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান।

জ. এই গ্রামে প্রায় ২০০০ গারোদের বসবাস রয়েছে।

১.৩.২ আইলাতলী গ্রাম

ক. আইলাতলী গ্রামটি হালুয়াঘাট সদর থেকে ৩ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত। গ্রামটি ৪নং হালুয়াঘাট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত।

খ. এই গ্রামে কোনো চার্চ কিংবা স্কুল নেই। কাছাকাছি রাংড়া পাড়ায় একটি চার্চ, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মিশনারি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে গারো ছেলেমেয়েরা লেখা পড়া করে।

গ. এই গ্রামেও বাঙ্গালীদের পাশাপাশি গারোরা বসবাস করে।

ঘ. এই গ্রামটিতেও এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছায়নি।

ঙ. স্থানীয় গারোদের ভাষ্যমতে গ্রামের গারো লোক সংখ্যা প্রায় হাজারের কাছাকাছি।

চ. বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ্রামের দরিদ্র্যতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে।

গ্রাম দুটির তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি কোনো লিখিত ডকুমেন্ট পাইনি। গ্রামের লোক সংখ্যাও গারোদের অনুমান নির্ভর। যখন গবেষক গারোদের ঐতিহাসিক বিষয়াদি, যেমন তাদের পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে সমতলভূমিতে নেমে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে তখন তারা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেন। কেউ কেউ বলেন তাদের পূর্ব পুরুষরা হাজার বছর ধরেই গ্রামগুলোতে বসবাস করছে। বাঙ্গালীরা পরে এখানে অনুপ্রবেশ করেছে। ধর্মান্তর সম্পর্কেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। তবে গ্রাম দুটির প্রায় সব গারোই অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। গ্রাম দুটির অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ করে গারোদের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে মন্দ। তবে শিক্ষিত গারো যারা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলগুলোতে চাকুরি করে তাদের অবস্থা অনেকটাই ভালো। গ্রামের গারো পরিবারগুলো নিজেদের মধ্যে অনেকটাই একতাবদ্ধ এবং আমুদে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodologies)

গবেষণার লক্ষ্যপূরণে গবেষণা পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সামাজিক অন্বেষণের অনেক বিকল্প পথ, পদ্ধতি ও শর্ত আছে তথাপি যে কোনো গবেষণা কাজ সম্পন্ন করার কোনো সংক্ষিপ্ত এবং সহজ পথ নেই। যাই হোক আদিবাসী সমাজ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে পদ্ধতি বিদ্যা কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিক দাবী করে।

আমি আমার গবেষণা কর্মে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য বিশেষণাত্বক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Method) ব্যবহার করেছি। কারণ হচ্ছে, সমাজ বিজ্ঞানে এমন অনেক বিষয় আছে যার তথ্য বা উপকরণ গাণিতিক সংখ্যায় গণনা কিংবা পরিমাণ পরিমাপ করা যায় না। বৈশিষ্ট্য বা গুণে প্রকাশ করা যায়।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমি এই গবেষণা কর্মে প্রাথমিক স্তরের উৎস (Primary Source) এবং দ্বিতীয় স্তরের উৎস (Secondery Source) দুই ধরনের উৎসই ব্যবহার করেছি।

প্রাথমিক উৎসের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে, অংশগ্রহণ করে পর্যবেক্ষণ (Participant Observation), নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ (In- depth Interview) এবং কেইস স্টাডি পদ্ধতি (Case Study Method) ব্যবহার করেছি।

দ্বিতীয় স্তরের উৎস হিসাবে ইন্টারনেট, বইপত্র, ম্যাগাজিন, প্রবন্ধ, পূর্ববর্তী গবেষণাপত্র ইত্যাদির সহযোগিতা নিয়েছি। কলম, নোটবুক, ক্যামেরা ইত্যাদি উপকরণ গবেষণা কর্মে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

গবেষক মাঠ পর্যায়ে গবেষণার পূর্বে একটি খসড়া চিত্র এবং অনাবদ্ধ ধরনের প্রশ্নপত্র (Open ended Question) তৈরি করি গারোদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। এভাবে আমি মোট ৩০জন উত্তরদাতা বাছাই করে (যাদের মধ্যে ১৫ জন আসকিপাড়া এবং ১৫ জন আইলাতলীর) নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। আসকিপাড়া এবং আইলাতলী গ্রামের মোট ৫টি কেইস স্টাডি সম্পন্ন করি। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বয়জৈষ্ঠ গারোদেরকে এক্ষেত্রে নির্বাচন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের গবেষণার জন্য আমি নভেম্বর ২০১০ থেকে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত হালুয়াঘাট এবং ঢাকায় বসবাসরত হালুয়াঘাটের গারোদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি।

১.৪.১ অংশগ্রহণ করে পর্যবেক্ষণ (Participant Obserbation):

মানুষের সমাজ এবং সংস্কৃতির বুঝতে সবচাইতে সঠিক পন্থা বা পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় 'অংশগ্রহণ করে পর্যবেক্ষণ' পদ্ধতিকে একজন পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে গবেষক গারোদের সাথে নিবিড়ভাবে মিশে তাদের জীবন এবং সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টা করেন। গবেষক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরাসরি তাদের সাথে কথা বলেন। তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের বিভিন্ন উৎসব যেমন– ওয়ান্না (ওয়ানগালা) অংশগ্রহণ করেন। চার্চ, স্কুল, বাজার, বৈঠক অর্থাৎ যে সব জায়গায় গারোরা যাতায়াত করে সে সকল জায়গায় গিয়ে তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথ বলেছেন। মাঠ পর্যায়ে গারোদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে গবেষক সাথে নোট বই এবং ক্যামেরা সঙ্গে নেন এবং তথ্যাদি সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করেন। গারোদের জীবন এবং সংস্কৃতিকে জানার জন্য গবেষক যে সব জায়গায় গারোরা বসবাস করে বিশেষ করে সুসংস দুর্গাপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল এবং মধূপুরও ভ্রমণ করেন।

১.৪.২ কেস স্ট্যাডি

এই গবেষণা কর্মে গবেষক, গবেষণার লক্ষ্য পূরণে সমর্থ আইলাতলী এবং আসকিপাড়া গ্রামের ৫ জন গারো উত্তরদাতাকে নির্বাচন করেন। কেইস স্ট্যাডির লক্ষ্যকে সামনে রেখে কেবল গবষেণার লক্ষ্য পূরণ হয় এরকম প্রশ্ন উত্তরদাতাকে করা হয়। গবেষক প্রয়োজনীয় ও সঙ্গতিপূর্ণ তথ্যাদি স্ট্যাডির সময় নোটবুকে লিপিবদ্ধ করেন। প্রশ্ন করার সময় গবেষক একটি চেক লিস্ট ব্যবহার করেন এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন সময় আলাপচারিতার মাঝে মাঝে উত্তরদাতার কাছ থেকে তার মতামত জানতে চাওয়া হয়। দীর্ঘ সময় ধরে উত্তরদাতার সঙ্গে থেকে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের অবতারণা করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৫ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো, ধারণায়ন এবং সাহিত্য পর্যালোচনাঃ

(The Theoritical Framework of the study, conceptual framework and the literature reviowe).

সমাজবিজ্ঞান চর্চায় তত্ত্বের ব্যবহার ও তত্ত্ব নির্মাণে এ দুটি প্রক্রিয়া রয়েছে। আমার গবেষণা কর্মে, বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীর তত্ত্বের আলোকে আদিবাসী গারো সমাজের ধর্মীও পরিচয় এবং সামাজিক বিচিহ্নতাবোধের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা থাকবে। তত্ত্ব নির্মাণ ও তত্ত্ব অভীক্ষণে, সমাজবিজ্ঞানে তিন ধরনের আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায়–

অর্থাৎ তিনভাবে তাত্ত্বিক উক্তিকে সংগঠিত করতে দেখা যায় : (ক) শ্রেণী বিন্যাসমূলক বা প্রকারভেদমূরক (Classificatory or Typological) (খ) কারণিক (Causal) ও (গ) স্বতঃসিদ্ধ মূলক (axiomatic) [কাজী তোবারক হোসেন, মুহাম্মদ হাসান ইমাম (সম্পাঃ) সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব, পৃঃ ২৩]

আমি আমার গবেষণায় তত্ত্ব অভীক্ষণে স্বতঃসিদ্ধমূলক আঙ্গিক (অীরড়সধঃরপ ঋড়ৎসধঃ) ব্যবহার করে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকে গবেষণার লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হব। সমাজবিজ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধমূলক আঙ্গিক অবরোহমূলক তত্ত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়। এ ধরনের তত্ত্ব বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য হলো–

(১) তাত্ত্বিক উক্তিসমূহের মধ্যে বিমূর্ত ও মূর্ত (abstract and concrete) উভয় ধরনের প্রত্যয় থাকবে;

(২) সম্পর্কনির্দেশক (relational) উক্তি ও প্রত্যয়সমূহ যে অবস্থায় বিদ্যমান তা বর্ণনা করার জন্য বেশ কিছু অবস্থানির্দেশক (existential) উক্তি থাকবে; এগুলো তত্ত্বের ব্যাপ্তি প্রকাশ করে (scope condition);

(৩) সম্পর্কনির্দেশক উক্তিসমূহ ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত (heirarchical order) থাকে। সবার উপরে স্বতঃসিদ্ধসমূহের অবস্থান ও তা থেকে অন্যান্য উক্তির যৌক্তিক উৎসারণ লক্ষণীয়।

স্বতঃসিদ্ধসমূহের নির্বাচন অনেকটা ইচ্ছাধীন হলেও কিছু মাপকাঠি দেখা যায় : (ক) স্বতঃসিদ্ধসসমূহ পারস্পরিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে, যদিও যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত হওয়া আবশ্যক নয়; (খ) স্বতঃসিদ্ধসমূহ বেশ বিমূর্ত হওয়া উচিত; (গ) এগুলো বিমূর্ত প্রত্যয়সমুহের সম্পর্ক বর্ণনা করে; (ঘ) সম্পর্ক 'আইনের' মতো হওয়া উচিত যাতে করে সেগুলো থেকে উদ্ভুত অপেক্ষাকৃত মূর্ত প্রস্তাবনাসমূহ প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে অপ্রমাণিত হতে না পারে ; এবং (ঙ) স্বতঃসিদ্ধসমূহের সত্যতা যাতে করে সিদ্ধ হতে পারে সেজন্য সেগুলো যথেষ্ট মাত্রায় সন্তোষজনক হওয়া উচিত। স্বতঃসিদ্ধমূলক তত্ত্বনির্মাণের সুবিধা হলো : (ক) বিমূর্ত প্রত্যয় ব্যবহার করা যায় যদিও সেগুলোর সরাসরি পরিমাপ প্রয়োজনীয় নয়, কারণ, যৌক্তিকভাবে সেগুলো পরিমাপযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাসমূহেয় সাথে যুক্ত থাকে। পরিমাপযোগ্য প্রস্তাবনা পরীক্ষিত হবার সাথে সাথে সর্বোচ্চ অবস্থিত স্বতঃসিদ্ধসমূহের নিরীক্ষণ হয়ে যায় ; (খ) স্বতঃসিদ্ধ থেকে প্রস্তাবনাসমূহের যৌক্তিক উদ্ভাবন অনেক সময় চমৎকার তথ্য ও সম্পর্ক উপস্থাপন করে।

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব অভীক্ষণঃ

সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ এই সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকে আমি গারো সমাজে আধুনিক শিক্ষার সম্পর্ক নিরূপনে নিম্নোক্ত অভীক্ষণটিকে তুলে ধরছিঃ

সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ এমন একটি সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যার ফলে সামাজিক মানুষ তার সামাজিক অসিত্বের কিছু ক্ষেত্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন অনুভব করে। সামাজিক পরিবেশ-সৃষ্ট অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা-দশা অনেক দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী উপলব্ধি করেছেন এবং দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের আওতায় এক নতুন প্রত্যয় যুক্ত করেছেন। Alienation is a socio-psychological condition of the individual which involves his estrangement from certain aspect of his social existence (Mitchel : 1968).

মার্কসের মতে, মানব সমাজের ইতিহাসে দুটি অধ্যায় রয়েছে- প্রকৃতিকে অধিকতর আয়ত্তাধীন করা এবং অধিকতর বিচ্ছিনআনতাবোধে আচ্ছন্ন হওয়ার ইতিহাস। মানুষ তার নিজ সৃষ্ট শক্তিসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পরাভূত হয়। এ শক্তিসমূহ তাঁর নিকট বিজাতীয়রূপে দেখা দেয়। মার্কসের প্রাথমিক দার্শনিক লেখনীতে বিচ্ছিন্নতাবোধ একটি প্রধান প্রত্যয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কাজী তোবারক হোসেন, মুহাম্মদ হাসান ইমাম (সম্পাঃ) সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব, পৃঃ ১৭৪]

বিচ্ছিন্নতাবোধ (alienation) প্রত্যয়টি সমাজতত্ত্বে দুইভাবে ব্যবহার হয়, প্রথমত ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বুঝাতে এবং দ্বিতীয়ত সামাজিক সম্পার্ক বুঝাতে (রবার্টস : ১৯৮৭)। কেলিকিন-ফিশম্যান (Kalekin-Fishman : 1996)- এর মতে, The term alienation refers to objective conditions, to subjective feelings, and to orientations that discourage participation.

সাধারণভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধ বা alienation বলতে সমাজ থেকে ব্যক্তির এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা দশা অথবা সামাজিক কর্তৃত্বের অবস্থান থেকে ব্যক্তির নিজের বিচ্ছিন্নতা, ব্যক্তি এবং সমাজ এ দুয়ের অস্তিত্বের মাঝে বিচ্ছিন্নতাবোধ।

কার্ল মার্কসের পর মেলভিন সিম্যান (Melvin seeman) প্রত্যয়টিকে সমাজতত্ত্বে জনপ্রিয় করেন। এমিল ডুরখেইম তার নৈরাজ্য (anomie) প্রত্যয়টি দ্বারা সমাজের আদর্শ বা মূল্যবোধহীনতাকে ব্যাখ্যা করেন যেখানে তিনি ব্যাক্তির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণহীনতাকে বক্তির নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যার কারণ বলে উল্লেখ করেন। এখানে anomie প্রত্যয়টিও অনেকাংশে alienation এর সমার্থক।

একবিংশ শতাব্দীতে alienation প্রত্যয়টি দ্বারা ফেলিক্স গিয়্যার **(Felix Gyer)**, লরেন ল্যাম্যান (Lauren Langman) এবং কেলিকিন ফিশম্যান (Kalekin Fishman) তত্ত্বটি দ্বারা সমসাময়িক পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। (ইন্টারনেট)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু দিকে জর্জ জিমেল (Georg Simmel) এবং ফার্ডিনান্দ টনিস (Ferdinanad Tonnies) এর তাত্ত্বিক লেখা Indivisualization এবং urbanization-এ alienation তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন।

তাত্ত্বিক আলোচনা আমার মূখ্য উদ্দেশ নয়, এখানে আমার মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর তত্ত্বের আলোকে গারো সমাজে ধর্মীয় পরিচয় এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধে আধুনিক শিক্ষার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা। মেলভিন সিম্যান তার On the Meaning of Alienation এ বিচ্ছিন্নতাবোধ মডেলের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

(ক) ক্ষমতাহীনতা (Powerlessness)

(খ) অর্থশূন্যতা (Meaninglessness)

(গ) আদর্শহীনতা (Normlessness)

(ঘ) সামাজিক বিচ্ছিন্নতা (Social isolation)

(ঙ) আত্ম বিচ্ছিন্নতা দশা (Self estrangement)

এছাড়া বার্ট্রান্ড রাসেলর আধুনিক শিক্ষাত্ত্ব গারোদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্লেষনে ব্যবহার করা হবে।বার্ট্রান্ড রাসেলের আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের মূল উপাদান গুলো হলোঃ ক.আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক খ.এ শিক্ষা ব্যবস্থায় বালক-বালিকাদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ থাকবে গ. শিক্ষাব্যবস্থা হবে সর্বজনীন ঘ. এবং শিক্ষাকে আলঙ্কারিক করার চেয়ে প্রয়োজনীয় করায় প্রবণতা।

১.৫.২ ধারণায়ন (Conceptualization)

এই গবেষণাকর্মের মূল ধারণা (concept) এবং চলক (variable) গুলোর তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হলোঃ

আদিবাসীঃ আদিবাসী বা indigenous শব্দটির কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা নেই, এটি মূলতঃ একটি নতুন পদ। কতোগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মানুষ তার নিজ দেশেই আদিবাসী হিসেবে পরিচিত।আন্তর্জাতিক সংস্থা আই.এল.ও কনভেনশন নাম্বার ১৬৯ অনুযায়ী কতোগুলো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে 'আদিবাসী'দের সংজ্ঞায়িত করেছে;

-যারা উপনেবিশিক সময়ের পূর্ব থেকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করছে

-উপনেবিশিক সময় থেকে যারা তাদের নিজেস্ব কৃষ্টি,সংস্কৃতি,সামাজিক,অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিয়ম মেনে চলছিল নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে।

অর্থাৎ আদিবাসী বলতে আমরা তাদেরকেই বুঝে থাকি যারা ঐতিহাসিক কাল থেকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে তাদের নিজেস্ব রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন,প্রথা,বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক,আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্য জনপদ গুলো থেকে ভিন্নতর জীবন যাপন করতো।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলাদেশের গারোদেরকে আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

আধুনিক শিক্ষাঃ

গবেষক এই গবেষণায় আধুনিক শিক্ষা বলতে বাংলাদেশের মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে নির্দেশ করছে। যে শিক্ষা ব্যবস্থা বার্ট্রান্ড রাসেলের আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী গণতান্ত্রিক। অর্থাৎ সকলের জন্য শিক্ষা রাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুযায়ী একটি মৌলিক অধিকার।

১.৫.৩ সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

নৃ-তাত্ত্বিক Tone Bleie-এর মতে, গারো এবং তাদের সংস্কৃতি নিয়ে খুব কম প্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ সংকলন রয়েছে। গারোদের জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রকাশিত বেশিরভাগ গ্রন্থে তাদের অধিকার এবং বন নিধন সম্পর্কিত বিষয় স্থান পেয়েছে (Tone Bleie : 2005)। গারোদের সম্পর্কে ১৭৯৩ সালে প্রথম লিখেন John Eliot (Bal Ellen :

1999) নামের একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা। উপনিবেশিক আমলের মাঝামাঝি সময়ে আমরা গারোদের সম্পর্কে বেশ কিছু লিখা পাাই। তারপর কিছু সরকারি কর্মকর্তা, মিশনারি এবং নৃ-তাত্ত্বিকগণ গারো সমাজ নিয়ে কিছু গবেষণা করেন। এবং সেই সব গবেষণার বেশিরভাগ-ই ভারতে বসবাসরত গারোদেরকে নিয়েই সম্পন্ন হয়। এই অঞ্চলে গারোদের সম্পর্কে প্রথম দিকার যত লেখা, সাহিত্য পাওয়া যায় তা মূলত প্রশাসনিক এবং মিশনারির লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত। এটা বলা যায় যে, গারোদের সম্পর্কে লিখিত প্রথম দিককার দলিলপত্র গুলো মূলত ব্রিটিশ শাসন সংক্রান্ত অর্থাৎ গারোদেরকে নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন করার কৌশল সম্পর্কিত তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ পরবর্তীতে কিছু গারো এবং নন-গারো (বাঙ্গালী এবং ভারতীয়) গবেষক গারো সমাজ নিয়ে গবেষণা করেছেন।

আমি আমার গবেষণার জন্য, গারোদের শিক্ষা, ধর্মান্তর এবং সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত গ্রন্থ, ওয়েব সাইট ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

সর্ব প্রথম যিনি সার্থকভাবে গারোদেরকে বিশ্ব দরবারে আসীন করেন তিনি একজন ইংরেজ সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা। তাঁর নাম মেজর এ, প্লেফেয়ার। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত আসামের গারো পাহাড় অঞ্চলের একজন জেলা প্রশাসক হিসেবে কমর্সরত ছিলেন। এই সময় তার কর্মাঞ্চলে বসবাসকারী গারোদের বৈচিত্রপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি গভীরভাবে গারোদের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেন "গারোজ" গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত সুনিপূণ ভাবে তার বর্ণনা করেন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে গারোরা দেশ-বিদেশে পরিচিত লাভ করে।

তারপর অনেক সমাজ বিজ্ঞানীও গারোদের বৈচিত্রময় জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহ বোধ করেন। তারা গারোদের নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাতত্ত্বিক, ভাষা, ইতিহাস, সমাজ ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, লোক সাহিত্য, ইত্যাদি বিষয়সমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের রচনাবলী ও গ্রন্থের মাধ্যমে বহির্জগতে ব্যাপক

পরিচিত দেন। সে সসময়ে চিয়েনাকানে, বাত্রীভি গাব্রিয়েল, তরুণ সিনহা, প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উত্তরকালে রবিন্স বার্লিং, মাধব চন্দ্র গোস্বামী, ধীরেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার (সিনিয়র), ধীরেন্দ্র নারায়ন মজুমদার (জুনিয়র), পরিমল চন্দ্র করে, দেরান সিং রংমুথু, ড. মিল্টন এস, সাংমা, জবান ডি, মারাক প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি গারোদের সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত রচনা ও গ্রন্থ দেশ বিদেশের পাঠকদের জন্যে উপহার দেন।

এদেশের আদিবাসীদের সম্পর্কে লেখার কাজে যিনি প্রথম অবদান রাখেন, তিনি জনাব আব্দুস সাত্তার। তিনি এদেশে প্রথম বাংলায় আদিবাসীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাদের বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক জীবন যাত্রার উপর সামান্য আলোকপাত করেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় ও একাধিক গ্রন্থে দেশের বিভিন্ন আদিবাসীদের উপর কিছু কিছু লেখা লিখে দেশবাসীকে আদিবাসীদের সম্পর্কে আরও জানার ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলেন। এতে আদিবাসীরা লেখকরাও উৎসাহী হয়েছেন সন্দেহ নেই।

গারোদের মাঝে রেভা. ক্লেমেন্ট রিছিল, টমাস স্নাল, ও সুভাষ জেংচাম গারো আইন সম্পর্কে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এগুলি মূলত অনুদিত গ্রন্থ। বাংলাদেশী গারোদের সামাজিক জীবন ধারার উপর বাংলাদেশী লেখকদের মধ্যে ড. কিবরিয়াউল খালেক প্রথম সার্থক মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার গ্রন্থ ইংরেজিতে প্রণীত।

সম্প্রতি গারোদের সাংস্কৃতিক জীবন ধারার উপর লিখিত বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ "গারোদের সাংস্কৃতিক জীবন ধারা" সুভাষ জেংচাম কর্তৃক রচিত হয়। গ্রন্থটি খ্রিষ্টদেহের ধর্ম পল্লী জলছত্র, টাংগাইল থেকে, রেভাঃ ইউজিন, ই, হোমরিক, সি, এস, পি কর্তৃক প্রকাশিত। এতে লেখক গারোদের নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক জীবন চর্চার রূপ রেখা অংকনে প্রয়াস পেয়েছেন।

উপজাতিয় কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি। তার জন্মলগ্ন থেকেই উপজাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। অত্র একাডেমির গবেষণা শাখা উপজাতিয় সাহিত্য রচনা ও প্রকাশনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটি উপজাতিয় সাহিত্য রচনার ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ইতিমধ্যে অত্র একাডেমী থেকে যে সব পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথম গারো মহিলা লেখিকা বিভা সাংমা রচিত “গারো ভাষা শিক্ষার সহজ পদ্ধতি” ও “গারো উপকথা” উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ দুটি বাংলা ভাষায় রচিত। প্রথমটি বাংলা ভাষাভাষী জনগণের জন্যে গারো ভাষা শিক্ষা লাভের সহজতম পথ নির্দেশ করছে। এতে গারো ভাষার কিছু ব্যাকরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি গারো ভাষার প্রচলিত কিছু উপকথার সংগ্রহ ও অনুবাদ। এটি গারো লোকসাহিত্যের একটি সংগ্রহ।

সংকলন ক্ষেত্রে উপজাতিয় কালচারাল একাডেমী একটা বলিষ্ঠ অবদান সৃষ্টি করে যাচ্ছে। প্রতি বছর অত্র একাডেমির গবেষণা শাখা থেকে ‘জানিরা’ নামে একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ‘জানিরার’ বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি সংখ্যায় উপজাতিদের ঐতিহাসিক, সামাজকি, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ক বেশ কিছু তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে। এছাড়া লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন সংগ্রহ যেমন, লোক-কাহিনী, লোক-ছড়া, কিংবদন্তী, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকচার ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত বেশষ কয়েকটি সংখ্যায় বিভা সাংমা, রেভা. ক্লেমেন্ট রিছিল, মনীন্দ্র নাথ মারাক, সুভাষ জেংচাম, বিধি পিটার দাংগ, সোহেল রেজা, হাজং নিখিল রায়, মতিলাল হাজং, আব্দুর রশীদ মিয়া প্রমুখ লেখকদের উপজাতি বিষয়ক বেশ কিছু মৌলিক তথ্যপুর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই সংকলনটি বৃহত্তর ময়মনসিংহের উপজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক রূপরেখা অংকনের পথিকৃত হয়ে থাকবে। এই সংকলনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপজাতিয় লেখকের লেখনী আত্ম প্রকাশ করছে।

‘মাটির সুবাস’ অত্র একাডেমীর আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উপজাতীয় সেই সঙ্গে স্থানীয় নবীন লেখক সৃষ্টির এটি একটি মহৎ প্রয়াস। উপজাতিয় জীবন ধর্মী গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা রচনার মাধ্যমে উপজাতিয়দের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্রায়ন ও তাদের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটানোই ‘মাটির সুবাসের’ লক্ষ। সংকলনটির ইতিমধ্যে ৪টি সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করেছে। এতে অনেক উপজাতিয় ও অ-অপজাতীয় স্থানীয় লেখক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বহু উপজাতিয় ও নবীন লেখকের আত্ম প্রকাশ ঘটেছে। উপজাতিয় নবীন লেখকদের সৃজনশীল করে তোলার ক্ষেত্রে ‘মাটির সুবাস’ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে বলে বিশ্বাস করি।

এছাড়া মুস্তফা মজিদ সম্পাদিত গারো জাতিসত্তা বইটিতে সুভাষ জেং চাম এবং রেভাঃ ক্লেমেন্ট রিছিলের লেখা প্রবন্ধে গারোদের আদি ধর্ম ও ধর্মান্তর সংক্রান্ত লেখায় বিভিন্ন তথ্যাদি এই সম্প্রদায় সম্পর্কে এবং তাদের ধর্ম এবং ধর্মান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছে।

উপরিউক্ত সাহিত্য পর্যলোচনার আলোকে আমি বলতে চাই গারোদের ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যই মূলতঃ তাদের একধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতাবোধ লুকিয়ে আছে এবং এটা বিশ্লেষন করাই আমার গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতাঃ

According to Stphen G.Gomes (1988), in an ethnographic study there are always some difficulties such as the selection of a representitive respondents, finding expected co-operation and building repport with the people, and these are eventuallty reflected in the quality of the data to be obtained.

একজন ভিন্ন সংস্কৃতির বহিরাগত হিসাবে গারোদের নিজেস্ব সংস্কৃতি এবং ভাষা না জানায় যখন আমি তাদের সঙ্গে কথা বলি কিংবা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, যদি সেখানে একাধিক

গারো ব্যক্তি উপস্থিত থাকে এবং যখন তারা নিজেদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলে আমি মূলতঃ তখন কিছুই বুঝতে পারিনা। যদিও গারোরা প্রায় সবাই বাংলা বলে তবুও তাদের একজন হলে হয়তোবা আরো গভীর ভাবে তাদের অনুভূতি গুলো বুঝা সম্ভব হতো। একজন গবেষক হিসাবে এটাকে আমি সবচাইতে বড় সীমাবদ্ধতা হিসাবে দেখি।

এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ে এ ধরনের গবেষণা কর্ম যে রূপ সময় দাবী করে সঙ্গত কারণে সে রূপ সময় ব্যয় করতে না পারাটা হচ্ছে দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা। কেননা এ জাতীয় গবেষণা কর্মে মাঠ পর্যায়ে আদিবাসীদের সঙ্গে নিয়মিত থেকে দীর্ঘ সময়কাল তাদেরকে প্রত্যক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী।

তৃতীয়তো আর্থিক সীমাবদ্ধতা যে কোন গবেষণা কর্মের উদ্দিষ্ট ফল লাভের সবচাইতে বড় অন্তরায়। গবেষণা কর্মটিতে কোনরূপ আর্থিক উপযোগ না থাকায় গবেষণা এলাকায় দীর্ঘদিন থাকা সম্ভব হয়নি।

চতুর্থতো গবেষণা সংশ্লিষ্ট বই পত্রের অভাব। এটি একটি বড় সমস্যা। আমাদের দেশের অন্য সকল সমস্যার ন্যায় জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় সমস্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিবাসী গারোদের ঐতিহাসিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিবাসী গারোদের ঐতিহাসিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে অভিবাসনকারী বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে গারো উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, নেত্রকোনার সুসং দুর্গাপুর, জামালপুরের শ্রীবর্দী, শেরপুরের নালিতাবাড়ি, টাঙ্গাইলের মধুপুর এবং সিলেটের সুনামগঞ্জের ধরমপাশা, তাহেরপুর ও বিশ্বম্বরপুর উপজেলায় এই নৃ-গোষ্ঠী ঐতিহাসিক কাল থেকেই বসবাস করে আসছে (ড. মাযহারুল ইসলাম তরু (সম্পা) : ২০০৯)।

গারোরা এখানকার ভূমিজ সন্তান নয়। নৃ-তত্ত্ববিদদের মতে উপমহাদেশের আদিম অধিবাসী মাত্রই বাইরে থেকে আগমন করেছে এবং ভাষাতত্ত্ববিদরাও বিভিন্ন আদিম জাতির ভাষা বিশ্লেষণ করে একই কথার সমর্থন জানিয়েছেন (আবদুস সাত্তার : ২০০৭ : চতুর্থ মুদ্রণ)। সারা বিশ্বে গারোদের মোট সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ এবং এদের বেশির ভাগই ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষত গারো পাহাড়ে বসবাস করে (চৌধুরী, কে, এ, এন : ২০০৭)। বর্তমানে গারোদের মোট জনসংখ্যারর প্রায় পাচের এক ভাগ বাংলাদেশে বসবাস করে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে বসবাসকারী গারোরা ভারতে চলে যায়।

বিশেষ করে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ, ১৯৬৪ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়। এদের অনেকেই আর শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ফিরে আসেনি।[১] বহির্বিশ্বে গারোরা তাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিশেষত তাদের ব্যতিক্রম পারিবারিক সম্পর্কের জন্য পরিচিত (বার্লিং : ১৯৯৭)।

গারোদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য আছে। হালুয়াঘাটের গারোরা গবেষককে সঠিক করে বলতে পারেনি

তাদের পূর্ব পুরুষের কত আগে থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করছে। মূলত গারোদের আদিম ইতিহাস সম্পর্কে নানান মতভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন তথ্য রয়েছে। শিরোনামে উল্লেখিত বিষয় বস্তু বিশ্লেষণে আমরা গারো এবং গারোদের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা নিতে পারবো যা গবেষণার মূল বিষয় বস্তু এবং লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রায় দুইশত বছর ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৪৭ সালে ভারতকে ভেঙ্গে, ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করা হয়। সেই সময় বর্তমান বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের একটি অংশ। ভারত বিভাগের ক্রান্তিকালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কারণে বহু হিন্দু এবং আদিবাসীরা ভারতে চলে যায়। ১৯৬৪ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধেও বহু আদিবাসী এ দেশ থেকে চলে যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর সাথে আদিবাসীরাও ভারতে আশ্রয় নেয় এবং তাদের অনেকেই (আদিবাসী) আর শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ফিরে আসেনি।

২.১ বাংলাদেশে গারোদের গোড়াপত্তন

আদিবাসী গারোরা ঠিক কোন সময়ে এ অঞ্চলে তাদের বসতি গড়ে তুলে তার সম্পর্কে জানার জন্য আমি আমার গবেষণা এলাকা হালুয়াঘাটের কয়েক জন বয়জেষ্ঠ্য গারো ব্যক্তির সাথে কথা বলি এবং বিভিন্ন তথ্য সূত্রের আলোকে তার উত্তর জানার চেষ্টা করি নিচে এ অঞ্চলে গারোদের গোড়াপত্তন তথা তাদের আগমন এবং বসতি স্থাপন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলোঃ

নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে বাংলাদেশের গারোরা গারো পাহাড়ের গারোদেরই বংশধর। কবে কিভাবে তারা গারো পাহাড় থেকে এসে বাংলাদেশের সমতলভূমিতে বসতি স্থাপন করেছে তা সঠিক করে বলা যায় না। কারণ, তাদের এই স্থানান্তর সম্পর্কে কোনো লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। গারোরা নিজেরাও এ ব্যাপারে কোনো ধারণা দিতে পারে না (কিবরিয়াউল খালেক : ২০০৭)।

গারো পাহাড়ের নাম অনুসারে এখানকার আদিম অধিবাসীদের গারো বলা হয়। গারো সম্প্রদায় প্রধানত দুই শ্রেণীর। আঞ্চলিক ভাষায় এদের নামকরণ করা হয়েছে আচ্ছিক (Hill Garo) ও লামদানী (Plin Garo) আচ্ছিক শ্রেণীর গারোদেরকে গারো পাহাড়ের অভ্যন্তরে গহীন অরণ্যে বাস করতে দেখা এবং গারো পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে লামদানী গারোরা (আবদুস সাত্তার : চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৯)। স্যার হার্বার্ট রিজলির মতে, গারোদের আদি বাসভূমি ছিল আসাম প্রদেশে। চেহারাগত বৈশিষ্ট্যে এরা আসামের খাসীয়া, নাগা ও মণিপুরীদের উত্তরাধিকারী। এই কারণে Dotor J. H. Hutton গারোদের মঙ্গোলীয় বলে উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত নৃ-তত্ত্ববিদ ডেল্টন লিখেছেন অর্যদের ভারতে প্রবেশের পূর্বেই যে উপজাতি কোচ বিহার ও আসামে বসবাস করছিল তারা হলো গারো ও খাসিয়া। জাতিতত্ত্ববিদ মেজর এ প্লেফেয়ার্স বলেছেন, ‘কোনো সূদুর প্রাগৈতিহাসিক যুগে গারোরা উত্তর পশ্চিম চীন দেশের ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াং প্রদেশে বাস করত, সেখান থেকে তারা তিব্বতে এসেছিল এবং ক্রমে প্রায় ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দে আসাম ও কোচ বিহারে বসবাস করতে লাগল’ [ড. মাযহারুল ইসলাম তরু (সাপাঃ), ২০০৯, গারো সম্প্রদায় : সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃঃ ১৮]।

জানিরা গবেষণা জার্নাল এ(৭ম সংখ্যা, ১৯৮৬, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী বিরিশিরি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা)বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক রবিন্স বার্লিং মান্দিদের উৎপত্তি খুঁজতে গিয়ে তার একটি প্রবন্ধে মান্দি ভাষার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেন। তার মতে আসাম ও বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের ভাষা, নেপাল, বর্মা ও তিব্বতের বেশির ভাগ ভাষা এবং দক্ষিণ চীনের কিছু অংশের লোকদের ভাষা নিয়ে গঠিত হয়েছে এক বিশেষ ভাষা গোষ্ঠী যার নাম ‘টিবেটো বার্মান’। এর অন্তর্ভুক্ত ভাষা হচ্ছে টিবেটান ও বার্মিজ এবং সে জন্যই এই ভাষাগোষ্ঠী ‘টিবেটো বার্মান’ নামে পরিচিত।

গারোদের গল্প ও কাহিনী অনুসারে জানা যায় যে, গারোরা খ্রিস্ট জন্মের হাজার বৎসর পূর্বে এই উপমহাদেশ জাপপা, জালিনপা, মুমপা, বংগিপা, ইংলিপা, দপপার, রাজিদপা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আগমন করে। কালক্রমে বিভিন্ন সময়ে তারা বহু যুদ্ধবিগ্রহ করে হিমালয়ের পাদদেশে, আসামের বিভিন্ন স্থানে কোচবিহার ও গৌড়ে ছড়িয়ে পরে এবং বসতি স্থাপন করে। গারোরা হিমালয় পর্বতকে চুমা বা চিমা আব্রি বলত। কালক্রমে আবার বহু রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করে গারোরা আসামেই আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সংকুচিত হয়ে পড়ে। প্রাচীন প্রাগ জ্যোতিষপুর কামরূপ রাজ্যের কোনো কোনো বংশে তারা রাজত্বও করে।

বর্তমানে গারোরা ভারতের মেঘালয়, আসাম, পশ্চিম বঙ্গের কোচ বিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং ত্রিপুরা রাজ্য এবং বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও সিলেট জেলায় বসবাস করে। (মণীন্দ্র নাথ মারাক, গারো জিসন্তা ২০০৬, পৃঃ ৬৯)

২.১.১ বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে গারোদের আনুমানিক বসতি স্থাপনকালঃ

বর্তমান বাংলাদেশে গারোদের প্রথম বসতি স্থাপনকালের কোন ঐতিহাসিক তথ্য নির্ভর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আনুমানিক নবম থেকে দশম শতাব্দির মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর সীমানা বরাবর গারো পাহাড়ের পাদদেশে সমভূমি এলাকায় গারোরা বসতি স্থাপন শুরু করে এবং বিভিন্ন দলনেতার নেতৃত্বে বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় সুসং দুর্গাপুরে গারো রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণে। জানা যায় সুসং দুর্গাপুর এলাকায় গারোরা নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষ ভাগ পর্যন্ত অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিল। ঐ সময়কালে তারা বিভিন্ন দলনেতার নেতৃত্বে সুসং দুর্গাপুরে রাজত্ব করে। অবশেষে শেষ গারো রাজা বাইস্যা মন্দা তাঁহার বিশ্বাসঘাতক হিন্দু ধর্মালম্বী মন্ত্রি সোমেশ্বর

পাঠকের হাতে ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। রাজা বাইয়্যার নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এতদঞ্চলে গারোদের সৌভাগ্যসূর্যও অস্তমিত হয়ে যায়। খুব সম্ভবত ঐ সময়কালের মধ্যেই গারোরা বর্তমান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তাহাদের এই বসতি স্থাপন দক্ষিণে ঢাকা জেলার সাভার, ধামরাই কালিয়াকৈর, শ্রীপুর, টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল কালিহাতি, ঘাটাইল প্রভৃতি এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। মধ্যযুগে ঐসব ঐলাকা গহীন অরণ্যে আবৃত ছিল, সুতরাং সেইসব এলাকাই ছিল গারোদের কাছে বসবাসের সুযোগই তাদেরকে এসব এলাকায় বসবাসে উদ্বুদ্ধ করে। তাদের এই বসতি স্থাপনের

বিস্তৃতি বংগদেশে মোগলদের প্রত্যক্ষ প্রভাবকালের সূচনা পর্যন্ত বর্তমান ছিল। পরবর্তীতে মোগল প্রভাব যখন এদেশে চরমে পৌছায় এবং বহিরাগতরা যখন ঐসব এলাকায় বসবাস আরম্ভ করে তখন গারোরা ক্রমান্বয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয় অর্থাৎ উত্তর দিকে সরে আসিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ শাসনামলে তাদের বাসস্থান সংকুচিত হয়ে প্রায় বর্তমানের পর্যায়ে এসে পৌছায়। বর্তমানে ঢাকার শ্রীপুরে কিছু সংখ্যক পরিবার বাদে সেই জেলার অন্যত্র আর কোন গারোদের বসবাস নাই। অপরদিকে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল, মধুপুর, ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা, ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, ফুলপুর, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, জামালপুর ও শেরপুর জেলার শ্রীবর্দি, নকলা, নালিতাবাড়ি, শেরপুর, ঝিনাইগাতি, বখশিগঞ্জ, নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা, দূর্গাপুর, কলমাকান্দা এবং সুনামগঞ্জ জেলার তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় গারোরা বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে আসছে। এ ছাড়া বৃহত্তর সিলেট জেলার বিভিন্ন চা বাগানে বেশ কিছু সংখ্যক গারোর বসবাস রয়েছে, যাদের বেশিরভাগই অভিবাসী শ্রমিক এবং অন্যান্য কর্মচারী।

টাঙ্গাইলের মধুপুরের গড়াঞ্চলে গারোরা এখন পর্যন্তও এককক বৃহত্তম অধিবাসী হিসেবে বসবাস করছে এবং তাদের সংখ্যা আনুমানিক বিশ হাজার। সম্ভবত মধ্যযুগে তাদের পূর্ব পুরুষেরা সেখানে প্রথম

বসতি স্থাপন করে। ব্রিটিশ শাসনামলের প্রাক্কালে নবাবী আমলে অত্র এলাকায় গারোদেকে নাটোরের রানী ভবানীর প্রজা হিসেবে চিহ্নিত হতে দেখা যায় এবং সেই মর্মে তাদের ভূমিস্বত্বের কাগজপত্রাদিও পাওয়া যায়। নাটোরের রানী ভবানী খুব সম্ভব যৌতুক হিসেবে এই এলাকার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সেটা দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে দান করেছিলেন।

অত্র এলাকায় বসবাসরত গারোদের নিকট প্রাপ্ত তথ্য ও পুরানো রেকর্ডপত্রে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নবাবী শাসনামলে এতদাঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক গারোর বসবাস ছিল এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থাও উন্নত ছিল।

(সুভাষ জেংচাম : বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়, পৃঃ ৬,৭)

২.১.২ গারো নামকরণঃ

গারোরা নিজেকে গারো নামে অভিহিত হতে পছন্দ করে না। তাদের বিশ্বাস গারো নামটি বিধর্মীদের দেওয়া এবং উহা শ্লেষাত্মক। তবে এই গারো নামের উৎপত্তি কখন এবং কিভাবে হয়েছে সেটা অদ্যাবধি সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। অনেকের মতে গারো পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান বাংলাদেশের সীমানার কাছাকাছি এক সময়ে গারোদের অন্যতম শাখা গারা-গানচংয়ের ব্যাপক বসতি ছিল এবং তৎকালীন বংগদেশের বাংগাল অধিবাসীরা তাদের সঙ্গেই পরিচিত লাভ করে, যার ফলে বাংগালীরা ঐ শাখার নামানুযায়ী সবাইকে সম্বোধন করতে থাকে এবং কালক্রমে সম্বোধনটি গারোতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

অন্যদিকে অনেকের বিশ্বাস মধ্যযুগে সীমান্তবর্তী হিন্দু জমিদারেরা যখন গারোদের বশ্যতা আদায়ের উদ্দেশ্যে সমতল এলাকায় অবস্থিত হাট-বাজারের গারোদের আগমন বন্ধ করে লবণসহ তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহে বিঘ্নসৃষ্টি করিত তখন পাহাড়ি গারোরা প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে সীমান্তবর্তী সমতলে অতর্কিত সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করে পলায়ন করত। এইভাবে

দিনের পর দিন গারোরা দুর্দমনীয় বেগে সীমান্ত এলাকার জমিদারগণকে ব্যতি-ব্যস্ত করে রাখত। ফলে হিন্দু জমিদারগণ তাদেরকে ‘ঘারুয়া’ (দুর্বিনীত, জেদী, একরোখা) জাত নামে অভিহিত করত এবং কালক্রমে উক্ত ‘ঘারুয়াই’ গারু হতে গারোতে রূপান্তরিত হয়। বৃটিশরাও প্রথমদিকে গারুয়ার অনুকরণে গারোদিগকে (Gharrowa) লিখতেন। গারো নামকরণে আরও অন্য কারণও থাকতে পারে, তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় গারো নামটি অপরের দেওয়া এবং উপরে বর্ণিত দুইটি কারণকেই গারো নামকরণের যুক্তিযুক্ত কারণ বলেয়া মনে হয়। গারোরা কিন্তু কোনদিনই নিজেকে গারো নামে অভিহিত হতে পছন্দ করে নাই এবং এখন পর্যন্ত করে না। যেহেতু গারো শব্দটি এখন সর্বত্র প্রচলিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে গৃহিত সেহেতু গারোরা অনিচ্ছসত্ত্বেও নামটি মানিয়া নিতে বাধ্য হয়েছে। তাহারা নিজেরা কিন্তু নিজেকে অচিক মান্দে (পাহাড়ের মানুষ) কিংবা সংক্ষেপে শুধু আচিক বলেয় পরিচয় দিতেই পছন্দ করে।

২.১.৩ দৈহিক গঠন ও সাধারণ স্বাস্থ্যঃ

গারোদের দৈহিক গঠন অন্যান্য মংগোলীয় লোকজনের অনুরূপ। অধিকাংশের নাক চ্যাপ্টা, চোখ ছোট, চোয়াল সামান্য উঁচু, মখমণ্ডল গোলাকার ও লোম বিরল। তাদের গাত্রবর্ণ প্রায় ক্ষেত্রেই ফর্সা কিংবা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের।

Doctor J. H. Hutton গারোদের মঙ্গোলীয় বলে উল্লেখ করেছেন। অরোমশ, বিরল শ্মশ্রু, চ্যাপ্টা নাক, ভারি ভুরু ও ফর্সা গায়ের রং ইত্যাদি মঙ্গোলীয় নরবংশের লক্ষণ এবং এই লক্ষণগুলো গারোদের মধ্যে বিদ্যমান।

২.২ গারোদের সামাজিক কাঠামোঃ

সমগ্র গারো সমাজ মোট তেরটি দলে বিভক্ত এবং এই দলগুলির মধ্যে আচার ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস, কথা ভাষ ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত গারো পাহাড়ের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্নাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলেও সেই সঙ্গে জীবিকা নির্বাহের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণের ফলেই এসব দল ও সামাজিক পার্থক্যের অবতারণা হয়েছে। নিচে গারোদের তেরোটি দলের নাম এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হলো :

১. আওয়ে বা আখাওয়েঃ

আখাওয়ে মানে সমভূমির বাসিন্দা এবং আওয়ে মানে হল কর্ষণকারী অর্থাৎ কৃষক। এই দলভুক্ত গারোরা আসামের কামরূপ, নওগাঁ, দরং, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জেলায় এবং মেঘালয়ের উত্তর সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীর বরাবর গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সমভূমিতে বসবাস করে থাকে।

২. আবেংঃ

গারোদের মধে আবেংরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রভাবশালী দল। পশ্চিম গারো পাহাড় জেলার প্রায় অর্ধাংশে, বাংলাদেশের গারো অধ্যুষিত এলাকাসমূহের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ এলাকাতে এবং খাসী ও জয়ন্তী পাহাড়ের সীমানা বরাবর অনেক এলাকাতেই আবেংদের বসবাস। বাংলাদেশের আবেংরাই সংখ্যায় সর্বাধিক দল এবং তাদের কথ্য ভাষায় ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

৩. আত্তংঃ

গারোদের মধ্যে আত্তংরাও বেশ প্রভাবশালী এবং বর্ধিষ্ণু দল। গারো পাহাড়ের সোমেশ্বরী নদীর অববাহিকায় বাঘমারা হইতে

উজানে সিজু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় এবং বাংলাদেশের কলমাকান্দা অঞ্চলে আত্তংদের বসবাস ।

৪. রূগা:

মেঘালয়ের ডালুর নিকট ভোগাই নদীর উত্তর তীরে এবং বাংলাদেশের দুর্গাপুর অঞ্চলে রূগাদের বসাবস ।

৫. চিবক:

মেঘালয়ের ভোগাই নদির উজান অববাহিকায় এবং নিতাই নদির উত্তর তীরের গারো পাহাড় অংশে ও বাংলাদেশের হালুয়াঘাট অঞ্চলে চিবকদের বসবাস ।

৬. চিসক:

গারো পাহাড়ের উত্তর পূর্বাংশের উত্তর বাহিনী দুধনাই ও কৃষ্ণাই নদীদ্বয়ের উৎসস্থলের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে চিসকদের বসবাস ।

৭. দোয়াল:

গারো পাহাড়ের মধ্যাঞ্চলে সোমেশ্বরী নদির উজান অববাহিকায় সিজুর উত্তরে বিস্তীর্ণ এলাকায় এবং বাংলাদেশের দুর্গাপুর অঞ্চলে ও ধোবাউড়া এলাকায় দোয়ালের বসবাস ।

৮. মাচ্চি:

গারো পাহাড়ের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় মাচ্চিদের বসবাস ।

৯. কচ্চু:

গারো পাহাড়ের উত্তর পশ্চিমাংশে আবেং ও আওয়েদের বাসভূমির মধ্যবর্তী এলাকায় কচ্চুদের বসবাস। বাংলাদেশের মধুপুর গড়াঞ্চলে কিছুসংখ্যক কচ্চুর অস্তিত্ব দেখা যায় ।

১০. আতিয়াগ্রা:

কচ্চুদের বাসভূমির কিছু দক্ষিণে আতিয়াগ্রা দলের বসবাস ।

১১. মাৎজাংচি/মাত্তাবেং:

গারো পাহাড়ের মধ্যাঞ্চলে তুরারেঞ্জের আরাবেল্লা পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় ইহাদের বসবাস।

১২. গারা গানচিং:

গারো পাহাড়ের দক্ষিণ সীমানায় বর্তমান বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর নিতাই নদীর অববাহিকায় গারা-গানচিংদের বসবাস।

১৩. মেগাম্:

গারো এবং খাসী ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে চিকমাং পাহাড়ের উত্তর ও পূর্ব পাদদেশে, বাংলাদেশের কলমাকান্দার উত্তর পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ এলাকায় মেগামদের বসবাস। এছাড়া গারদের মাহারীর অধিকার,মৃতের সৎকার ব্যবস্থা এবং জামাই ঠিক করা সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা। নিম্নে সংক্ষেপে সেটা বর্ণনা করা হলো:

পরিবারের উপর মাহারীর অধিকার

কোনো পরিবারের স্বয়ংসিদ্ধ কিংবা ঘোষিত উত্তরাধিকারিণী না থাকিলে এই পরিবারের কর্ত্রীর নিকটতমা আত্মীয়া এবং তাহার অভাবে দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়া ঐ কর্ত্রীর অবর্তমানে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করিবে।

মৃতের সৎকার ব্যবস্থা

মৃতব্যক্তির সকল আত্মীয়স্বজন এসে না পৌছা পর্যন্ত এবং তাদের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সাধারণত মৃতদেহের সৎকার করা যায় না। গারো সমাজের সকল দলেই এই রীতি প্রচলিত।

জামাই ঠিক করা

সাধারণত মেয়ের পিতা তাহার মেয়ের জন্যে তাহার আপন বোনের পুত্রসন্তানকে ঘর জামাই হিসেবে আনয়ন করে। তবে ইহার অভাবে যতদূর সম্ভব নিজ মাহারীর নিকটাত্মীয়দের মধ্য হতে ঘর জামাই

আনতে চেষ্টা করে এবং এই রীতি গারো সমাজের সকল দলেই প্রচলিত।

২.২.১ গারোদের মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা

আমরা প্রায় কম যেশী সবাই জানি গারো আদিবাসীরা মাতৃতান্ত্রিক একটি জাতিসত্তা।সেজন্য এ গবেষণাকর্মে আমি কেবল তাদের মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য গুলি তুলে ধরছি। নিচে সংক্ষেপে তাদের মাতৃতান্ত্রিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো ব্যাখ্যা করা হলোঃ

ক. গারো মাতৃতন্ত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য যা সহজে লক্ষ করা যায়, তা হচ্ছে মাতৃ-কুলীয় বংশ পরিচয়। সন্তানেরা মাতার গোত্র ধরে বংশ গণনা করে। অর্থাৎ সন্তানেরা মাতার গোত্র নাম ধারণ করে। পিতার গোত্র নাম ধারণ করে না। গারোয়া চাচ্চি, মাহারী বা মাচক শব্দের দ্বারা গোত্র বোঝায়। পিতা যদি আরেং গোত্রের হয় এবং মাতা রিছিল গোত্রের হলে, তাদের সন্তান রিছিল গোত্রের পরিচয় বহন করে। এই ভাবে মাতৃ গোত্রের নামে পরিচিত হওয়াকে বলে মাতৃকূলানমিক পরিচয়। বাংলাদেশের গারো ও খাসিয়া এই দুইটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃকুলানমিক বংশ পরিচয় দেখা যায়। ভারতে অবশ্য আরও কয়েকটি মাতৃকুলানমিক আদিবাসী আছে, যেমন দক্ষিণ ভারতের নায়ার আদিবাসী এবং সোপলা আদিবাসী । নৃতত্ত্বাবিদ ঐবহৎু গড়ৎমধহ বলেন, পুরাতন প্রস্তর যুগে সমস্ত জাতি ও উপজাতিই ছিল মাতৃকুলানমিক ও মাতৃতান্ত্রিক। যে নৃতত্ত্বাবিদরা আদিবাসীদের উপর গবেষণা করেছেন তারা বলেন; এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু মাতৃকুলানমিক আদিবাসী রয়েছে।

খ. গারো মাতৃতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাতৃসূত্রীয় উত্তরাধিকার প্রথা। এই প্রথা অনুযায়ী কেবল কন্যা সন্তানেরা পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনি হয়। পুত্র সন্তানেরা ঐ সম্পত্তির কোন অংশই লাভ করে না। গারোরা হয়তো মাতৃকুলানামিক প্রথা ত্যাগ করতে পারবে না যতদিন না তারা

মাতৃসূত্রীয় উত্তরাধিকার প্রথা পরিবর্তন করেছে ; কারণ ঐ দুইটি প্রথা অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পর্কযুক্ত ।

গ. গারো মাতৃতন্ত্রের তৃতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবারে ও সমাজে নারীর প্রাধান্য । নারী শাসিত পরিবার বললে বুঝতে হবে সেখানে পুরুষের অবস্থান গৌণ, তার ভাগ্য অনিশ্চিত অনেক সময় তাকে ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন ধারণ করতে হয় ।

ঘ. গারো মাতৃতন্ত্রের চতুর্থ প্রধান বৈশিষ্ট্য হচেহ নকনা-নক্রম প্রথা । পিতামাতা তাদের কন্যাদের মধ্যে একজনকে নকনা মনোনীত করে দেয়, তাকে তাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির বা অধিকাংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারীনি করে। এই কন্যাকে বলা হয় নকনা । নকনার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পিতামাতাকে পালন করা । এই নকনার জন্য পিতা আপন ভগ্নীপুত্রকে বা ভাগিনেয়কে জামাতা আনে। এইরূপ জামাতাকে বলা হয় নক্রম ।

২.২.২ গারোদের পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, নৃত্য, গান, লোক কাহিনীঃ

নিচে সংক্ষেপে গারোদের পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, নৃত্য, গান, লোক কাহিনী গুলো বর্ণনা করা হলোঃ

ক. পোশাক-পরিচ্ছদ

বর্তমানে বাংলাদেশের গারোরা পোশাক-পরিচ্ছদে অনেকটা বাংগালিই হয়েগেছে। পুরুষেরা, লুংগি, গেঞ্জি, পাজামা, পাঞ্জাবি, ফুলপ্যান্ট, শার্ট, ধুতি প্রভৃতি এবং মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট প্রভৃতি ব্যবহার করে। এক কথায় পোশাক-পরিচ্ছদে গারোরা হুবহু বাঙালি। যদিও গারোদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল, সেসব পোশাক-পরিচ্ছদ আজকাল কেউ সাধারণত ব্যবহার করে না। কেবলমাত্র বিশেষ কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় মেয়েরা ঐসব ঐতিহ্যবাহী পোশাক ব্যবহার করে থাকে।

খ. খাদ্যাভ্যাস

গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, নানাবিধ শাক-সবজি । আহারাদির কাজে গারোরা সাধারণত ধাতব বাসনপত্রই

ব্যবহার করে। পানীয় জল সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের কাজে তারা মাটি কিংবা এলুমিনিয়ামের কলস ব্যবহার করে।

শুটকি মাছ গারো ভাষায় যাকে নাখাম বলে সেই নাখাম গারোদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য।

গারোরা নানাজাতের পশুপাখির মাংস খেয়ে থাকে। মুরগি, হাঁস, শূকর ও খাসির মাংস তাদের প্রিয় খাদ্য। এর মধ্যে শুকরের মাংস তাদের সর্বজনীন প্রিয়। গো-মাংস অনেকেই পছন্দ করেন, তবে মাংসের জন্যে গো-হত্যা বর্তমানে তাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। খরগোসের মাংসও তারা পছন্দ করে।

বাঁশের কচি চারা অর্থাৎ কোঁড়ের তরকারিও গারোদের নিকট অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য বস্তু।

ব্যাঙের ছাতাও গারোদের অন্যতম প্রিয় সবজি। গারো সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনধারা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ধেনো পঁচুই মদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক উৎসবে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে, অতিথি আপ্যায়নে, নানা পালা-পার্বনে ধেনো পঁচুই মদ গারোদের নিকট অপরিহার্য। খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মোট জনগোষ্ঠীর আনুমানিক এক তৃতীয়াংশের মধ্যে মদ্যপানের প্রচলন নাই বললেই চলে। প্রতি বৎসর এই মদ প্রস্তুতের জন্যে প্রঅয পরিবারই বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চাল খরচ করে থাকে। (সুভাষ জেংচাম: ১৯৯৪)

গ. নৃত্য

গারো উপজাতির মধ্যে কবে নৃত্যের প্রচলন হয়েছিল সে ব্যাপারে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে নৃত্যের গতি প্রকৃতি ও উপকথা পর্যালোচনা করলে জানা যায় অতি প্রাচীনকাল থেকে ধর্মীয় ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্য অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

সাধারণত ‘গান্না’ অর্থাৎ নকমার অভিষেক অনুষ্ঠানে যুদ্ধ বিষয়ক নৃত্য, আঃসং খসি থাত্তা ও দেনঃবিলসিয়ার পূজার অনুষ্ঠানে মাংগনা

অর্থাৎ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে এবং ওয়ানগালা (নবান্ন) অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। এছাড়া আয়মারং খৃত্তা, দাকগিপা আমুয়া, সংআদিং খৃত্তা, নকদংগাআ, নকফান্থে নকদংগাআ ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠানেও নৃত্যানুষ্ঠান হতে দেখা যায়।

মেয়ে পুরুষ উভয়ই নৃত্যের অংশগ্রহণ করে। কোনো কোনো নৃত্য বিশেষ শ্রেণীর জন্য যেমন, 'গৃক্কা' ও 'ছাম্বিল মিসাআ' পুরুষদের এবং 'মি সুঃআ', 'দুঃদি মিসাআ', 'মিঃগারু দেনঃনা', 'বাঃরা সুঃআ' মেয়েদের মধ্যে সীমিত।

গোত্র ভেদে নৃত্যগীতের বিষয়বস্তু, মুদ্রা ও তালের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নৃত্যে সাধারণত কাহারবা, দাদরা ও খেমটা তাল ব্যবহৃত হয়। কোন কোন নৃত্য সব গোত্রের পরিচিত আবার কোন কোনটা বিশেষ গোত্র কর্তৃক সংরক্ষিত। (মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত 'গারো জাতিসত্তা' পৃষ্ঠা ২০৭)

ঘ. গান

গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিরিশিরি কালচারাল একাডেমীর প্রাক্তন সহকারি পরিচালক আবদুর রশীদ মিয়া গারোদের বেশ কিছু লোকগান উদ্ধার করেছেন।

'আসর বন্দনা' প্রচীন লোকপালার একটি বন্দন গীত। এসব প্রাচীন এবং আধুনিক আচিক মান্দি গানের এক মিলন ঘটিয়েছেন তার সংগ্রহে।

নিচে সেইসব গানের কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হলো।

॥ আ'সং থরিয়ানি গীত ॥

চিংআ বাংলা আসংনি
নমূল মেথ্রারাং।
গিচ্ছাম্ বিদিং গিসে পা
গীভাল রাবাগিপপা
চিংআ নমূল রাং চিংআ মেথ্রারাং ॥

অনুবাদ

আমরা বাংলাদেশের যত
যুবতী-তরুণী।
অন্ধকার পথ ছেড়েছি
করিয়া জয়ধ্বনি
মিলে সকলে, মিলে সকলে ॥

॥ ঘুমপাড়ানো গারো গীত ॥

সংগ্রহ : চামেলী রেমা

আংত্তুদে আম্বিদে
দেখো মিক্ খাং বায়েসা
দানাং দানাং- নুনু।
হাব্বিবা সিম্দিম্ দিম্, সিম্দিম্ দিম্
দানাং দানাং– আইয়াও
জানিরাখো নিনামো
দানাং দানাং-নুনু।

অনুবাদ

সোনা দানা দিদিমা
আমার পিঠে ঘুমায়রে ওহো ওহো
ঘন কালো পাহাড়ে তোমারে নিবরে
ঘুমা তুই-ওহো ওহো
বড় হলে আয়না দেব– ওহো ওহো
মুখ দেখিয়া খুশী হবে– ওহো হহো ॥

অনুবাদ : মো. আবদুর রশীদ মিয়া

ঙ. লোককাহিনী

গারো আদিবাসীদের মৌখিক সাহিত্য তথা লোক কাহিনী অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিভিন্ন আঙ্গিকে এই লোক কাহিনী যুগ যুগ ধরে গারো সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনোরঞ্জন করে আসছে এবং সেই সঙ্গে গবেষকগণের গবেষণার মূল্যবান উপাদন জুগিয়ে আসছে। সমগ্র গারো লোক কাহিনীকে প্রধান চারটি আঙ্গিকে ভাগ করা যায়। যথা– (১) ঐতিহ্যবাহী কাহিনী, (২) প্রণয় কাহিনী, (৩) অতিপ্রাকৃত কাহিনী ও (৪) বীরত্বগাঁথা।

ঐতিহ্যবাহী কাহিনী : এ পর্যায়ের কাহিনী মূলত গারোদের উৎপত্তি, তাদের আদি বাসভূমি ত্যাগ, বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ এবং পরিশেষে এই উপমহাদেশে তাদের আগমন ও স্থায়ী বসতি স্থাপনের আধা-ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ।

প্রণয় কাহিনী

গারো সমাজে প্রেমকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গল্প, কাহিনী, যা সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে বংশানুক্রমে কথিত হয়ে বর্তমানের অমর লোকগাঁথায় রূপান্তরিত হয়েছে।

অতিপ্রাকৃত কাহিনী

এ পর্যায়ের লোক কাহিনী প্রধানত আধাভৌতিক গল্প কাহিনী কিংবা দেব-দেবীর ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্রিক ।

বীরত্বগাঁথা

এ পর্যায়ের লোক কাহিনী প্রধানত গারোদের পূর্ব-পুরুষদের বীরত্ব, তাঁদের বুদ্ধিমত্তা এবং বীর্যবত্তার উপর কেন্দ্র করে কথিত ।

২.২.৩ গারোদের উৎসবসমূহ

কোনো জাতির বিভিন্ন উৎসব ও তা পালনের মধ্য দিয়েই সেই জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে তারা বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকে। উৎসবের কারণ ও গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে সেই জাতির রুচি, মন মানসিকতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায় ।

জুম চাষকে কেন্দ্র করেই গারোদের উৎসবাদি পালিত হয়ে থাকে । চাষাবাদের শুরুতেই দেবতার সন্তুষ্টি বিধান অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য। নিয়মিত বৃষ্টিপাত, ফসলের অনিষ্টকারী রোগ অথবা জীব-জন্তুর কোনো আক্রমণ অথবা উৎপাত যাতে না হয়, প্রচুর পরিমাণ শস্য যাতে উৎপাদিত হয় ও যাতে পরিবারে সুখ-সমৃদ্ধি বিরাজ করে তার জন্যে দেবতার নিকটে প্রার্থনা জানানো হয়। শস্য বপনের সময় হতে আরম্ভ করে বৃদ্ধি ও আহরণ ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে তারা বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকে। এর মধ্যে শস্য সংগ্রহের পর ‘ওয়ানগালা’ উৎসব সর্ব প্রধান। গারোদের উৎসব কৃষিভিত্তিক। নিচে গারোদের প্রধান প্রধান উৎসব যা তারা ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্বে পালন করতো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলোঃ

দেন বিলসিয়া (দেন– 'কাটা', বিলসি- 'বৎসর):

জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে চাষের জন্য স্থান নির্বাচিত হলে 'দেন বিলসিয়া' উৎসব 'নকমা' অর্থাৎ গ্রাম প্রধানের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

আসিরকা:

বিগত বৎসরের আবাদী জুম ক্ষেতে ধানের চাষ আরম্ভ করার পূর্বে এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে।

আগালমাকা:

নতুন জুম ক্ষেত কেটে ফেলে জঙ্গল শুকিয়ে গেলে মার্চের শেষ অথবা এপ্রিল এর প্রথমদিকে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষেতে আগুন ধরিয়ে দেবার পর আগালমাকা উৎসবের আরম্ভ।

রংছু গাল্লা (রংছু 'চিঁড়া', গাল্লা 'ফেলা'):

আগস্ট মাসে বিগত বৎসরের পুরাতন জুম ক্ষেতের ধান কাটার পূর্বে ও নতুন ক্ষেতের জুম সংগ্রহের পূর্বে এই উৎস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

জামেগাপ্পা আহাওয়া :

সেপ্টেম্বর মাসে ধান কাটা শেষ হলে এই উৎসব পালিত হয়।

ওয়ানগালা :

গারোদের সর্ব প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের নাম ওয়ানগালা'। ফসল তোলার পর এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গারোদের বিশ্বাস, দেবতা সালজং এর নির্দেশে সূর্য কোনো বীজ হতে চারা গাছের অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি, ফল ও ফসলের পরিপূর্ণতা, পরিপক্কতা ও প্রাচুর্যে সহায়তা করে থাকে। পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল তার উপর নির্ভরশীল। সে কারণে ক্ষেতে বীজ বোনার পূর্বে উত্তম ফসলের জন্য তার পূজা বাঞ্ছনীয়। ফসল তোলার পর তার পূজা করা হয়ে থাকে।

এ উৎসবের দুটি দিক আছে– একটি ধর্মীয় অপরটি সামাজিক। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা, পরে ব্যক্তিগত ও গ্রামের মঙ্গলের জন্য পূজা দেওয়া হয়। এরপর পানাহার ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে সামাজিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। তিনদিন ধরে এই উৎসব চলে।

রং দিক মিত্তি (‘রং দিক’ চাউল রাখার মাটির পাত্র, ‘মিত্তি’ দেবতা):

‘রংদিক মিত্তি’ একজন দেবী। যে মাটির পাত্রে চাউল রাখা হয় সেই পাত্রের ভিতরে তিনি অধিষ্ঠান করেন। তাকে পূজা দেওয়ার সময়ে নারীদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। এই পূজা গৃহের অভ্যন্তরে চাউল রাখার পাত্রের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়।

নকনি মিত্তি অথবা ফাকমানা দ’থাত্তা (‘নকনি মিত্তি’ গৃহ দেবতা, ফাকমানা দ’থাত্তা’ গৃহের সম্মুখস্থ দেওয়াল যেখানে মোরগ উৎসর্গ করা হয় ।‘রংদিক মিত্তি’র পূজা শুরু হলে খামাল গৃহের সম্মুখস্থ দেয়ালের নিকটে আসে। সেখানে গৃহ দেবতার উদ্দেশ্যে একটি লাল মোরগ উৎসর্গ করা হয়। রক্ত ও পালক সমস্ত দেওয়ালের গায়ে লাগানো হয়ে থাকে।

থ্রংনাদ’থাত্তা (ঘরের খুঁটির জন্য মুরগি উৎসর্গ):

ঘরের খুঁটি ঘরের ভার বহন করে গৃহস্থিত সকলকে ঝড়-বৃষ্টি, ভূমিকম্পের হাত হতে রক্ষা করে। নকনি মিত্তির নিকটবর্তী খুঁটিকে পবিত্র বলে মনে করে সকলের পক্ষে পূজা দেওয়া হয়। একটি মুরগি কেটে তার রক্ত ও পালক খুঁটির সারা গায়ে লাগানো হয়ে থাকে।

২.৪ গারোদের অর্থনৈতিক কাঠামো:

গারোদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পেশাগতভাবে তারা প্রায় সকলেই চাষী। অনাগতকাল হতে কৃষিকাজের উপরই জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। আদিতে তারা জুম চাষ করত। কিন্তু বর্তমানে কৃষিকাজের কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছে। অন্যান্যদের

ন্যায় তারাও সমতল ভূমিতে উন্নত মানের ধান, পাট, ভুট্টা, সরিষা, আনারস, বিভিন্ন উন্নত মানের শাক, সজ্জি উৎপাদন করে থাকে। কৃষি কাজ ছাড়া গারোদের ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকুরি ইত্যাদিতে খুব কম দেখা যায়। বর্তমানে শিক্ষিত গারোরা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন স্কুলে চাকরি করছে।

২.৪.১ গারোদের উত্তরাধিকার উত্তরাধিকার আইনঃ

গারো বিষয় সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার আইন গারো সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। সম্পত্তি বা ধনকে গারো ভাষায় 'গানজিন' বলা হয়। গারো পরিবারের সম্পত্তিকে প্রধানত দুভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

১. ঐতিহ্যমূলক সম্পত্তি ; ও ২. স্ব-উপার্জিত সম্পত্তি।

প্রথম শ্রেণীর সম্পত্তি পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী সম্পত্তি যা পূর্বাধিকারীদের নিকট থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে তাদের উত্তরাধিকারীদের হাতে অর্পিত হয়। এ সম্পত্তি প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আভিজাত্যের প্রতীক স্বরূপ বংশানুক্রমে রক্ষিতাবস্থায় থাকে। এ সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। যা পরিবারের সকল কন্যাদের মধ্যে বন্টন করা হয় না, যদিও তারা একই পরিবারে বসবাস করে থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পত্তি হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যা কোন ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় অর্জিত হয়; উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়।

বিভিন্ন সমাজে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা ও উত্তরাধিকার লাভ কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আইন ও প্রথানুযায়ী নির্ণিত হয়ে থাকে। গারো সমাজেও এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন রয়েছে। এসব আইন-কানুন কোনো রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ দ্বারা গৃহীত নয়। আদিম যুগে দলপতিগণ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুগ যুগ ধরে প্রচলিত

প্রথা ও রীতিনীতিই আজ সে সমাজের সামাজিক আইনে পরিণত হয়েছে। প্রাচীন গারো উত্তরাধিকার আইন হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. মাতৃতান্ত্রিক বিধিমতে গারো পরিবারের বিষয় সম্পত্তির উপর মেয়েরাই উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে। তবে পরিবারে সকল কন্যাগণ সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। গৃহকর্তী বা তার মাচং কর্তৃক নির্বাচিতা একজন কন্যাই সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে। নির্বাচিতা কন্যাকে গারো ভাষায় 'নকনা' বলা হয়। গা'মজিন বা সম্পত্তি যাতে স্মারক হিসেবে নির্দিষ্ট অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে এবং লুপ্ত না হয়ে যায়, সেই উদ্দেশ্যে নকনাকে জিইয়ে রাখা হয়। পিতামাতার প্রতি আনুগত্যই নকনার প্রধান গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণত পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যাকেই নকনা নির্বাচন করা হয়ে থাকে। নকনার জন্য তার (নকনার) পিতার আপন বোনের ছেলে বা ভাগ্নেকে জামাই হিসেবে আনা হয়। এই জামাইকে গারো ভাষায় 'নক্রম' বলা হয়। পরিবারের মান-সম্ভ্রম অক্ষুণ্ন রাখা, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, মা-বাবা বা শ্বশুড়-শাশুড়ির সেবা-যত্ন ও ভরণ-পোষণ, তাদের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন ও তাদের সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা নকনা ও নক্রমের দায়িত্ব। ঐতিহ্যমূলক সম্পত্তি বংশানুক্রমে মাতৃকুলের নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যেই এই 'নক্রম প্রথার' সৃষ্টি। পিতার আপন ভাগ্নে না থাকলে পিতার মাচং থেকে অন্য কোনো ছেলেকে নক্রম হিসেবে আনা হয়ে থাকে।

২. 'নক্রম' প্রথার সাথে 'আখিম' বিধি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যখন একজন পুরুষের সাথে একজন মহিলার বিয়ে হয়, তখন সে (মহিলা) তার স্বামীর ও স্ত্রীর মানকের 'আখিম' হয়, তদ্রুপই পুরুষ তার স্ত্রীর মানকের 'আখিম' হয়। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের উপর এবং পরস্পরের মাচং এর উপর পরস্পরের মাচং এর অধিকারকেই 'আখিম' বলা হয়। স্বামী-স্ত্রীর এবং তাদের উভয়ের মাচং এর মধ্যে বন্ধন ও যোগাযোগ রাখাই

আখিম বিধির উদ্দেশ্য। নক্রম বা নকনা ইচ্ছা করলেই একে অন্যকে ছেড়ে দিতে পারবে না। বিচ্ছেদের প্রয়োজন হলে নির্ধারিত জরিমানা (গ্রো/ডাই) দিয়ে আখিম মুক্ত হতে হয়।

৩. গারো পরিবারের আখিং পাত্তা সম্পত্তি গৃহকর্ত্রীর অধিকারে থাকে এবং তার মৃত্যুর পরে তা তার কন্যাদের মধ্যে নির্বাচিত নকনার অধিকারে থাকবে।

৪. যদি কোনো পরিবারে কোনো কন্যা সন্তান না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে গৃহকর্মী তার ভগ্নী বা মাসির যে কোনো অবিবাহিতা কন্যাকে পছন্দ মাফিক নকনা নির্বাচন করতে পারে। তবে গৃহকর্ত্রীকে এ ব্যাপারে কন্যার পিতামাতা ও ভ্রাদের মতামত নিতে হবে। নকনা নির্বাচন করতে পিতার যদি অমত থাকে, তাহলে মাতা তার পছন্দ মাফিক যে কোনো কন্যাকে নকনা নির্বাচন করতে পারবে এবং যাকে নকনা নির্বাচন করবে সে-ই নকনা বলে পরিগণিত হবে এবং সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করবে।

৫. গৃহকর্ত্রীর মৃত্যুর পরে যদি তার কন্যা সন্তানরা নাবালিকা থাকে, তাহলে গৃহকর্ত্রীর ভ্রা ও চাতচিরা তার নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে কাউকে তাদের (কন্যাদের) অভিভাবক নির্বাচন করবে।

৬. কোনো গৃহকর্ত্রী যদি কন্যা সন্তান জন্ম না দিয়ে অথবা নকনা নির্বাচন করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাহলে মৃত গৃহকর্ত্রীর মাচং বিপত্নীক ব্যক্তিকে নিজেদের মাচং থেকে একজন নতুন স্ত্রী প্রদান করবে। নকনা নির্বাচন করার ব্যাপারে সে-ই (নতুন স্ত্রী) মৃত স্ত্রীর ভূমিকা পালন করবে।

৭. মূলত নকনাই সম্পত্তির মালিক। নকনা ও নক্রম যদি গুরুতর কারণ ব্যতিরেকে পিতামাতার বাড়ি পরিত্যাগ করে চলে যায়, তাহলে নকনা তার নকনাগিরি হারাবে এবং উত্তরাধিকারমূলক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

৮. গারো পরিবারে স্বামী কেবল স্ত্রীর সম্পত্তির অভিভাবক ও পরিচালক মাত্র। নিজের নামে স্ব-উপার্জিত সম্পত্তি ছাড়া স্বামী তার স্ত্রীর সম্পত্তির মালিকানা দাবি করতে পারেনা। তবে স্ত্রীর সম্পত্তি ভোগ করার সম্পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে।

৯. স্বামীর স্ব-উপার্জিত সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর স্ত্রীর অধিকারে চলে আসে।

১০. বিশেষ ক্ষেত্রে পিতার স্ব-উপার্জিত সম্পত্তি গারো ছেলেরাও পেতে পারে। যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কন্যা সন্তানহীন অবস্থায় একত্রে মৃত্যুবরণ করে এবং এ সময়ে তাদের পুত্র-সন্তান থেকে থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে স্বামীর স্ব-উপার্জিত সম্পত্তি তার পুত্রই পেয়ে যাবে।

১১. যদি কোনো পুরুষ যৌতুক স্বরূপ কোনো সম্পত্তি মাতাপিতার কাছ থেকে পেয়ে থাকে, তাহলে তার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি তার (স্বামীর) মা-বোনেরা দাবি করে ফিরিয়ে নিতে পারে।)

১২. কোনো গারো গৃহস্বামী তার স্ত্রী, কন্যা ও পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মতামত না নিয়ে কোনো সম্পত্তি বিক্রয়, প্রদান বা হস্তান্তর করতে পারে না।

২.৪.২ পেশাঃ

নিচে সংক্ষেপে গারোদের অতীত এবং বর্তমান পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি তুলে ধরা হলোঃ

অতীতপেশা

কৃষি কাজই বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীবিকা। অতীতে এই দেশ যখন জনবিরল ছিল, দেশের অধিকাংশ এলাকা, বিশেষত উত্তরাঞ্চল যখন ঘন বনে আবৃত ছিল, তখন গারোরা ঝুম চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। তখনকার দিনে জমি-জমা, বন-জংগল, প্রভৃতির উপর এত কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কাজেই

গারোরা নিজের ইচ্ছা এবং পছন্দমত জংগল নির্বাচন করে ঝুম চাষ করত। ঢাকার ভাওয়াল এলাকা হতে শুরু করে বর্তমান টাঙ্গাইলের মধুপুর, কালিহাতি, ঘাটাঈল প্রভৃতির উচ্চভূমি এলাকা এবং ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া, ও ভালুকার উচ্চ ভূমি ঝুম চাষের এক আদর্শ স্থান ছিল। ফলে গারোরা প্রধাণত ঐসব এলাকাতেই প্রথমদিকে বসতি স্থাপন করে।

প্রতি বৎসর জানুয়ারি হইতে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি নির্দিষ্ট জংগল নির্বাচন করে গ্রামের লোকজন সবাই মিলে একযোগে জংগলটি পরিষ্কার করে ফেলতো। পরিষ্কার করার পর পরিবার পিছু সমভাবে পরি-কৃত জমি ভাগাভাগি করে দেওয়া হতো। গ্রামের মোড়ল অর্থাৎ নকমাই এসব কাজে নেতৃত্ব দিতেন। এপ্রিল মাসের দিকে মৌসুমী বৃষ্টির প্রাক্কালেই যে যার নির্দিষ্ট জমিতে বীজ বপণের কাজ সেরে ফেলতো। বীজ বপণের কাজ শক্ত কাঠের সুঁচালো লাঠির সাহায্যে সারা হতো। একই জমিতে একই সঙ্গে ধানের পাশাপাশি, ভুট্টা, কাউন, তুলা, ফুটি, কুমড়া, আলু, কলাই প্রভৃতি ফসল এবং সবজীর বীজ বপণ করা হতো। প্রথম বৃষ্টির পরপরই সমুদয় ফসলের নতুন চারা গজিয়ে উঠতো এবং তখনই আরম্ভ হইত ফসল পরিচর্যার আসল কাজ। সারা মে জুন দু-মাস এই চারাগুলি পরিচর্যা, আগাছা পরিষ্কার, বন্য পশু-পাখি বিতরণ কাজে গারোরা ব্যস্ত থাকতো। ঐ সময়টি ছিল তাদের অভাবেরও সময়। কারণ নতুন ফসল না ওঠা পর্যন্ত তাদের অনেকের ঘরেই খাবার থাকত না। কাজেই ব্যস্ত হয়ে অনেককেই ঐ সময়ের মধ্যে বন্য আলু, বাঁশের কোঁড়, কাঁঠাল, প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হইত। ঐ সময়ে জঙ্গলে বিভিন্ন প্রকারের বন্য আলু প্রচার পাওয়া যেতো। গারোরা সে সব আলু আহরণ করে জীবন ধারণ করতো। সে-সব আলু গারোদের নিকট বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন থামান্দি, খাজা, থাবাঙাল, খাগিচ্ছ্যক, আমকেং, স্টেং প্রভৃতি। সে সব আলু ছিল আবার প্রচুর খাদ্যপ্রাণ সমৃদ্ধ। কাজেই ভাতের অভাবে গারোরা সে সব আলু সাময়িকভাবে সংগ্রহ করে খেয়ে জীবনধারণ করলেও তাহারা পুষ্টিহীনতায় ভুগতো না।

বনাঞ্চলের গারোরা যেমন আগেকার দিনে ঝুমচাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো তেমনি অপর দিকে সমভূমি অর্থাৎ শেরপুর, নালিতাবাড়ি, ফুলপুর, হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা প্রভৃতি এলাকার গারোরা ঐ সময় হালচাষের মাধ্যমে কৃষি ভিত্তিক জীবিকা নির্বাহ করোত। দেশের অন্যান্য বাসিন্দাদের মতোই তারাও গরু মহিষের সাহায্যে চাষাবাদ করে ধান, পাট, সরিষা প্রভৃতি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো। তখনকার দিনে দেশের লোকসংখ্যা যেমন কম ছিল, চাষাবাদ যোগ্য জমিজমার পরিমাণও ছিল প্রচুর। অবশ্য সমভূমিতে জমির মালিকানা তখনকার দিনেও ছিল সুনিয়ন্ত্রিত এবং সে সব জমির সুনির্দিষ্ট খাজনা ট্যাক্সও ছিল। তথাপি প্রতিটি গারো পরিবার তখনকার দিনে প্রচুর ভু-সম্পত্তির মালিক ছিল। প্রতিটি পরিবার উৎপন্ন ফসলে নিজের সারা বৎসরে খোরাকী মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রিয় করে সারা বৎসরের আনুষঙ্গিক সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতো। সাধারণত ধান ও পাট এই দু টি প্রধান ফসলই গারোরা উৎপন্ন করতো। একমাত্র সরিষাবাদে অন্যান্য রবি শস্য উৎপাদনে তারা দক্ষ ছিল না এবং প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতো না। গোবর সার প্রয়োগই ছিল জমি উর্বতা সৃষ্টির একমাত্র মাধ্যম। এ ছাড়া প্রতি বৎসর একই জমি নিয়মিত চাষাবাদ না করে পরপর কয়েক বৎসর পতিত গোচারণ ভূমি হিসেবে রেখে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হতো।

বর্তমান পেশা

অতীতের মতোই গারোদের পেশা বর্তমানেও প্রধাণত কৃষিনির্ভর। শতকরা প্রায় ৯৫ জন গারো কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তবে অতীতের মতো হালুয়াঘাট, মধুপুর, ঘাটাইল, ফুলবাড়িয়া, মুক্তাগাছা, ভালুকা এলাকায় বসবাসরত গারোরা আর ঝুমচাষের মাধ্যম জীবিকা নির্বাহ করে না। বরং অন্যান্য সমাজের লোকজনের মতোই হালচাষের মাধ্যমে চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করে। কারণ ঐসব এলাকার বনাঞ্চল বর্তমানে প্রায় নিশ্চিহ্ন এবং সরকারের বন বিভাগের নানা বিধিনিষেধের

বেড়াজালে আবদ্ধ। ফলে ঐসব এলাকায় বসবাসরত গারোরা অন্যান্য এলাকায় গারোদের মতোই হালচাষ রপ্ত করে নিয়েছে এবং তার পাশাপাশি ফলমূলের চাষেও রীতিমত দক্ষ হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশে বসবাসরত মোট গারো জনসংখ্যার আনুমানিক শতকরা ৯৫ জন কৃষি এবং শ্রমজীবী। বাকি ৫ জন চাকুরীজিবী। চাকুরীজিবীদের অধিকাংশষই বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় বিভিন্ন পদে কর্মরত। তাদের অনেকেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও বেশ কিছুসংখ্যক গারো, স্কুল শিক্ষক, ধর্ম প্রচারক প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত আছেন। আঙুলে গোনা যায় এমন মুষ্ঠিমেয় কপিতয় ব্যক্তি সরকারি চাকুরিতে কর্মরত আছেন এবং সরকারের দেশ রক্ষা বিভাগেও বেশ কিছুসংখ্যক তরুণ কর্মরত রয়েছেন। এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন হাসপাতালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় গারো তরুণী সেবিকা পদে কর্মরত আছেন। তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা গারো সমাজে খুবই কম।

তৃতীয় অধ্যায়

গারোদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ

তৃতীয় অধ্যায়

গারোদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ

৩.১ আদিবাসী গারো সমাজের প্রাথমিক শিক্ষা চিত্র

এই গবেষণা কর্মের একটি প্রত্যয় আধুনিক শিক্ষা এবং আর একটি প্রত্যয় আদিবাসী গারো সমাজ, প্রত্যয় দুটি দ্বারা গারো সমাজের সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধের ব্যখ্যা বিশ্লেষন করাই হচ্ছে গবেষণা কর্মটির মূল উদ্দেশ্য।পূর্বের প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যয় দুটি সম্পর্কে কার্যকরী সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।এ অধ্যায়ে গারোদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রাথমিক চিত্র তুলে ধরা হবে এবং তথ্য গুলো নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় স্তরের উৎস বিশেষ করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবং জাবারাং কল্যান সমিতির দুটি গবেষণা পত্র থেকে ।

বিশ্বের সকল শিশুর শিক্ষালাভের অধিকার একটি জন্মগত অধিকার। জন্মের পর একটি মানুষের যেমন বেঁচে থাকবার অধিকার রয়েছে, তেমনি তার নিজের মায়ের ভাষায় শিক্ষালাভেরও অধিকার রয়েছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের ৪৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের বিষয় নিয়ে এখনো ভাবনাই শুরু হয়নি। এ বিষয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে আলোচনাও হয়নি। ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এর মূল কথাই হলো, বিশ্বের বুকে যে ৬ হাজার ভাষা রয়েছে, সেগুলোকে রক্ষা করা এবং এর উন্নয়ন সাধন করা। কেননা ভাষা হারিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া। ১৯৯৬ সালর ভাষা বিষয়ে বার্সিলোনা ঘোষণার মূল কথাই ছিল, সকল ভাষার মর্যাদা সমুন্নত করা। এছাড়া আই এল ও কনভেনশন ১০৭-এ আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং এ কনভেনশন বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থন করেছে। ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পাহাড়ি শিশুদের জন্য অন্তত পঞ্চত শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায়

শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং এ কনভেনশন বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থন করেছে। ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পাহাড়ি শিশুদের জন্য অন্তত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় পড়াশোনার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত এগুলো বাস্তবায়িত হয়নি।

২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, পাহাড়ে, সীমান্তে যাদের গ্রাম, সেই আদিবাসীরা কি এর সুফল পাবে? নাকি বরাবরের মতো আদিবাসীরা আবারও উপেক্ষা ও অবহেলার শিকার হবে ?

আদিবাসীদের প্রাথমিক শিক্ষার কি অবস্থা তা জানার জন্য আদিবাসীদের দুটি সংগঠন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবং জাবারাং কল্যাণ সমিতি আলাদা আলাদাভাবে কাজ করেছে। জাবারাং কাজ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১২টি আদিবাসী সম্প্রদায়কে নিয়ে এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কাজ করেছে সমতল এলাকার ৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষা চিত্র নিয়ে। দেশের আদিবাসীদের শিক্ষা সংক্রান্ত চিত্র প্রায় একই রকম।

আদিবাসীদের শিক্ষা চিত্র নিয়ে আমাদের দেশে খুব একটা কাজ হয়েছে বলে জানা যায়নি। আদিবাসীদের অস্তিত্বের প্রতি সাংবিধানিক অস্বীকৃতি, তাদের অধিকারহীনতা, ক্রমাগত ভূমি হারানো, আইনের আশ্রয় না পাওয়া, জীবনের নিরাপত্তাহীনতা ও হুমকি, উন্নয়নের নামে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ, মিথ্যা মামলা ও হয়রানি– এরকম বহুমাত্রিক সমস্যার মধ্যে শিক্ষা সমস্যাকে আদিবাসীরা স্বভাবতই অনেক নিচের দিকে নিয়ে এসেছেন।নিচে আদিবাসীদের সংক্ষিপ্ত শিক্ষাচিত্র তুলে ধরা হলোঃ

৩.১.১ ভৌত কাঠামোঃ

আদিবাসী ও পাহাড়িরা সাধারণত প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস করেন। এর ছাপ স্কুলগুলোর মধ্যেও দেখা যায়। মাটির বা বেড়ার তৈরি জীর্ণ ঘরের মধ্যে আদিবাসী এলাকায় সরকারি-বেসরকারি

স্কুলগুলো পরিচালিত হয়। জীর্ণ স্কুলঘরে স্থান সংকুলান না হওয়াতে বারান্দায় ক্লাশ নিতেও দেখা যায়। তবে টিনের চালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ও দেখা যায়। এনজিওরা আদিবাসী এলাকায় অস্থায়ী বেড়ার স্কুলঘর তৈরি করে বা ঘর ভাড়া নিয়ে স্কুল পরিচালনা করে থাকে। যেমনঃ হালুয়াঘাটের আসকি পাড়া ব্র্যাক আদিবাসী স্কুল। আর থানা সদরগুলোতে পাকা ভবনের স্কুল দেখা যায়। অধিকাংশ স্কুলে টয়লেট নেই। যেগুলোতে রয়েছে– সেগুলোর অধিকাংশই ব্যবহারোপযোগী নয়। কিছু কিছু স্কুলে টিউবওয়েল দেখা যায়– তবে সেগুলোর মধ্যেও কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশই এখন সচল নেই।

৩.১.২ সহ পাঠক্রমিক কার্যক্রমঃ

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম হয় না। বিশেষত তুলনামূলকভাবে যোগাযোগের অসুবিধা এবং প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে এ চিত্র বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩.১.৩ বই প্রাপ্তি

যেহেতু দেশের অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই নিয়মিত এবং সময়মত বই পৌঁছে না, সেহেতু অনেককে পুরনো বই দিয়েই পড়াশোনা চালাতে হয়। আবার টাকা দিয়েও কাউকে বই কিনতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বইগুলো বিনামূল্যে বিতরণ হওয়ার কথা থাকলেও অনেক অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী বলেছেন যে, কোনো কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ফিস হিসেবে কিছু টাকা দিয়ে বই নিতে হয়। শিক্ষকদের অনেকে এ ফিস বা টাকাকে বই বহনের খরচ হিসেবে নেওয়া হয় বলে জানান। আবার শিক্ষা অফিস থেকে দাবী করা হয়– স্কুলগুলোতে পাঠ্যপুস্তক যথাযথভাবে পৌঁছানোর জন প্রয়োজনীয় বহন খরচ সরকারিভাবেই সরবরাহ করা হয়।

৩.১.৪ ঝরে পড়াঃ

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য প্রদানকারীরা ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা করেছেন। তবে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি।

আদিবাসী শিশুরা কেন ঝরে পড়ে?

– দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে অনেক অভিভাবক তাদের শিশুকে স্কুল থেকে নিয়ে যান;

– স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত বিষয়গুলো আদিবাসী শিশুদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে না বলে অনেক শিশু মাঝপথে স্কুল ত্যাগ করে;

– শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষাগত পার্থক্যের কারণে অনেক শিশু স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে;

– সমতল এলাকার আদিবাসী ছেলে-মেয়েরা খ্রীস্টান মিশন স্কুলে পড়ালেখা করার ফলে সকল প্রকার সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে মাঝ পথে গিয়ে শিশুরা শিক্ষা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে।

– বিদ্যালয়ের সাথে শিশুদের বাড়ির দূরত্বের কারণে অনেক শিশু নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না। অনিয়মিত হতে হতে শিশুটি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়;

– অসচেতন ও শিক্ষাহীন অভিভাবকরা শিশুদের পড়ালেখা বাড়িতে তদারকি করতে পারেন না। ফলে, শিশুরা স্কুল সময় ছাড়া অন্য সময়ে লেখাপড়া করে না এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় না। এ কারণেও অনেক শিশু স্কুল ত্যাগ করে।

আদিবাসী শিশুদের স্কুলে না যাওয়ার কারণসমূহ

– দুর্গম রাস্তা ও গ্রাম থেকে স্কুলের দূরত্ব অনেক এ কারণে অনেক শিশু স্কুলে যায় না;

– অভিভাবকদের শিক্ষা সম্পর্কে অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে অনেক শিশু স্কুলে ভর্তি হয় না ;

– দারিদ্রতার কারণে অনেক অভিভাবক ইচ্ছা থাকলেও তাদের শিশুকে স্কুলে দিতে পারেন না। তাদের মতে, ‘ছেলে-মেয়েকে বেশিদূর পড়ানোর সামর্থ্য আমাদের নেই, ঠিকমত খাতা, কলম দিতে পারি না, পোশাক দিতে পারি না।’

– গৃহস্থালী কাজে নিয়োগ করার জন্য অনেক অভিভাবক শিশুকে স্কুলে পাঠান না।

৩.১.৫ পারিবারিক ব্যয়ঃ

আদিবাসীদের পারিবারিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত ব্যয় নির্ণয় করা সহজ নয়। কেননা, কোনো পরিবারই মূলত প্রাথমিক শিক্ষা খাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পেছনে কি পরিমাণ খরচ করে, তার সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করে না বা বলতে পারে না। আমরা আদিবাসীদের সাথে কথা বলে এবং পরিবার জরিপ থেকে যেসব তথ্য পেয়েছি, তা নীচে দেখনো হলো :

প্রত্যক্ষ ব্যয় হচ্ছে একটি পরিবারের প্রতিটি শিশুর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট খরচাদি, যার মধ্যে ভর্তি ফি, পরীক্ষা ফিসহ অন্যান্য ফি, খাতা-কলম-পেন্সিলসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ক্রয়, স্কুলের পোশাক, বই ক্রয়, টিফিন খরচ, গৃহশিক্ষক বাবদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত এবং পরোক্ষ খরচের মধ্যে আলাদা জ্বালানি বাবদ কেরোসিন ইত্যাদি খরচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.১.৬ শিক্ষার মানঃ

নিচে মানসম্মত শিক্ষা/আধুনিক শিক্ষা নিয়ে গ্রামবাসী, শিক্ষক,সরকারী কর্মকর্তা এবং শিশুদের মতামত উল্লেখ করা হলোঃ

– শিক্ষা পাওয়াই যেখানে দূরূহ কাজ, সেখানে মানসম্মত শিক্ষার প্রসঙ্গ অমূলক;

– আগেকার দিনের বাল্যশিক্ষায় জীবন সংশ্লিষ্ট শিক্ষণীয় অনেক বিষয় ছিল। তাই শুধুমাত্র বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করেও অনেকে গুণীজন হওয়ার মতো যোগ্যতা (যেমন– কবিতা, গান, ইতিহাস ইত্যাদি রচনা করতে সমর্থ) অর্জন করতেন। বর্তমান পাঠ্যপুস্তকেও জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলে শিশুরা পড়ালেখায় উৎসাহ পাবে এবং শিক্ষার মানও বৃদ্ধি পাবে। তাদের মতে, ভালো করে কোনো কিছু লিখতে ও পড়তে পারাকে তারা মান সম্মত শিক্ষা বলে।

শিক্ষকদের মতামত

প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক উপকরণ পাওয়া গেলে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে এবং এতে শিক্ষার মানও বৃদ্ধি পাবে।

সরকারি কর্মকর্তাগণের মতামত

ভাবাগত সমস্যা দূর করা, বার বার শিক্ষক, বদলী না করা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা, শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর করা, অভিভাবকের দারিদ্রতা দূর করা। এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে সরকার যদি কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারে, তাহলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।

শিশুদের মতামত

স্কুলে যদি শিক্ষক নিয়মিত আসেন এবং ভালো করে পড়ান, তাদের দৈনন্দিন পোশাক, খাতা, কলম, টিফিন ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, স্কুল ঘর যদি সুন্দর হয়– তবে তারা স্কুলে যেতে এবং পড়ালেখা করতে উৎসাহবোধ করবে। স্কুলে নিয়মিত যেতে পারলে তারা ভালো করে পড়ালেখা করতে পারবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। আদিবাসীরা শিক্ষার সমস্যার চেয়ে তাদের অন্যান্য সমস্যা যেমন ভূমি অধিকার, অস্তিত্ব রক্ষা ও নিরাপত্তার মতো মৌলিক সমস্যায় জর্জরিত। তাই তাদের অনেকের পক্ষে শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কে ভাবনার অবকাশ থাকে না। আদিবাসী সমাজে অনেক ছেলে মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েও ঝরে পড়ছে। অনেক পরিবার রয়েছে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো কিন্তু এসব পরিবারের অভিবাবকগণ তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহ বোধ করেন না এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা তাদেরকে আকর্ষণও করে না। আবার এমন অভিভাবকও রয়েছে যারা দিনমজুর করে, খেটে খায় তারা তাদের ছেলে-মেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছে। ফলে তাদের দরিদ্র পরিবারে শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত এই ব্যয় আরও সমস্যা তৈরি করছে। আর এক সময় টাকা পয়সার অভাবে তাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে। আবার অনেক ছেলে-মেয়ে তাদের মা-বাবার অসচেতনতার কারণেই ঝরে পড়ছে। এমন আদিবাসী অভিভাবকও আছেন, যারা নিজেদের ছেলে মেয়ে কোন ক্লাশে পড়ালেখা করে তাও ঠিকমতো জানেন না।

৩.২ প্রান্তিক গারোদের শিক্ষার সুযোগ এবং সমস্যাঃ

প্রান্তিক গারোদের শিক্ষার সুযোগঃ শুধু প্রন্তিক গারোরাই নয় বাংলাদেশের প্রায় সকল আদিবাসী এবং অধিবাসীদের প্রান্তিক শিক্ষার চিত্র একই রকম। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোর দুর্বল অবকাঠামো, শিক্ষা প্রশাসনের অব্যবস্থাপনা এবং মান সম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব, অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি ইত্যাদি নানাবিধ কারনের সাথে উচ্চ পর্যায়ের দরিদ্রতা প্রন্তিক গারোদের শিক্ষার সুযোগ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের পর খুবিই সীমিত।মিশনারী, এনজিও,বেসরকারী এবং সরকার পরিচালিত বিভিন্ন বিদ্যালয়,কলেজ এবং খুব সীমিত সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গারো ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে।

১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধু গারো ব্যাপ্টিস্ট ইউনিয়ন দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাই হলো ৭৪। এই ৭৪টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১৪,৬১৯ ছেলেমেয়ে ওই বৎসর পড়েছে। তন্মধ্যে ৬,০৯৮ জন খ্রিষ্টান ছেলেমেয়ে এবং ৮,৫২১ জন হিন্দু মুসলমান ছেলেমেয়ে আছে। অর্থাৎ মুসলমান ছেলেমেয়ের সংখ্যাই বেশি।সেইসময় গারো ছেলেমেয়েরা কেবল মিশনগুলিতেই পড়াশোনা করছে। তদ্রুপ গারো ব্যাপ্টিস্ট ইউনিযন পরিচালিত দুটি হাইস্কুল ও ছটি জুনিয়র হাইস্কুল আছে, ঐগুলিতেও অ-খ্রিষ্টান মিশনগুলি দ্বারা পরিচালিত আরও ২০০টা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১০টা হাইস্কুল ও জুনিয়র হাইস্কুল আছে।বর্তমানে সরকারের সবার জন্য শিক্ষা প্রগ্রাম এবং আদিবাসী গারোদের নিজেদের শিক্ষা সচেতনতার জন্য হালুয়াঘাটের আইলাতলী প্রায় সকল গারোই লিখতে পড়তে পারে।আসকিপাড়া গ্রামের চিত্র ভিন্ন।

সমতলের আদিবাসীদের সমস্যা সমূহঃ

- বাইরে সমতল এলাকায় যে সকল আদিবাসী শিশু খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করে,তারা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।
- সমতল এলাকার অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানদের সরকারি প্রাইমারি স্কুল অপেক্ষা খ্রীস্টান মিশনারি স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী, কারণ তারা মনে করেন সরকারি স্কুল অপেক্ষা মিশনারি স্কুলে ভালো পড়ালেখা হয়।

জাবারাং (১২টি) এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম (৫টি) মোট ১৭টি আদিবাসী জাতিসত্তার সাথে পরামর্শমূলক সভা করে যে সমস্ত তথ্যাগুলো পেয়েছে তা নিম্নে দেখানো হলো :

- আদিবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারের কোনো কারিক্যুলাম নেই।
- আদিবাসীদের কাছে শিক্ষার চেয়ে অস্তিত্বের সংকট বড় সমস্যা।

- আদিবাসী শিশুরা স্কুলে শুরুতেই ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেমনঃ শিশুরা বাড়িতে আদিবাসী ভাষায় কথা বলে। কিন্তু স্কুলে এসেই তাদের ভিন্ন ভাষায় পড়াশোনা করতে হয়, যা শিশুদের জন্য খুব অসুবিধাজনক। এ কারণে অনেকে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং ঝড়ে পড়ে।
- আদিবাসী এলাকায় নিজস্ব স্কুলের অভাব এবং আদিবাসী শিক্ষকের অভাব
- শিক্ষা কারিক্যুলাম আদিবাসী শিশুদের জন্য মোটেই আকর্ষণীয় নয়। বইয়ে যা পড়ানো হয়, তাতে আদিবাসী জীবনের কেনো প্রতিফলন নেই।
- শিক্ষা সম্পর্কে আদিবাসী অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব রয়েছে।
- সমতল এলাকায় যে সকল আদিবাসী শিশু খ্রীষ্টান মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করে, তারা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।
- প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিবারের কত ব্যয় হয়, এ সম্পর্কে আদিবাসীদের ধারণার অভাব রয়েছে।

৩.৩ যারা শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পাচ্ছেঃ

উপরের আলোচনা থেকেই আমরা মুটামুটি একটা ধারণা পেয়েছি যে দরিদ্রতা হচ্ছে আদিবাসীদের সবচাইতে বড় সমস্যা।এই সমস্যা থেকে হালুয়াঘাটের আদিবাসী গারোরাও মুক্ত নয়।তবে গারোদের নিজেদের সচেতনতার জন্য তাদের ছেলেমেয়েরা অন্তত স্কুলে যাচ্ছে।তবে আসকিপাড়া এবং আইলাতলীতে গবেষক বিভিন্ন গারো ব্যক্তির সাথে কথা বলে যে সকল তথ্য পেয়েছে তার দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় বর্তমানে সেখানকার স্কুল,মিশনারী স্কুল এবং বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত গারো পরিবার গুলোর ছেলেমেয়েরা তুলনামূলক ভাবে

বেশী শিক্ষা সুযোগের আওতায় আছে।এ ছাড়া দরিদ্র পরিবার গুলোর চিত্র প্রায় একই রকম ।

৩.৪ আদিবাসী গারোদের শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয়ঃ

নিচে সংক্ষেপে আদিবাসী গারোদের শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবং জাবারাং কল্যাণ সমিতি যে সকল সুপারিশমালা তুলে ধরেছেন তা উল্লেখ করা হলোঃ

১) আদিবাসী বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনায় আদিবাসী লেখকদের অন্তরভুক্ত করা। রচনা চুরান্ত করবার পূর্বে আদিবাসীদের নিয়ে কনসালটেশনের আয়োজন করা;

২) বর্তমানে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর যে বই গুলোতে আদিবাসীদের বিষয়ে শিশুদের পড়ানো হচ্ছে, সেগুলো পরিবর্তন করে নতুন করে লেখা এবং এক্ষেত্রে আদিবাসী লেখকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৩) আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতিকে পাঠ্য পুস্তকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা ।

৪) পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসীদের সুন্দর মূল্যবোধ,সমষ্টিক সংস্কৃতি
চেতনা,ইতিহাস,সাহিত্য,গল্প,ঐতিহ্য,সংগ্রাম,পরিবেশ
সংরক্ষণে তাদের ভূমিকা ইত্যাদি অন্তরভূক্ত করা;

৫) জাতীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা কমিটিতে আদিবাসী প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা ।

গবেষক উপরিউক্ত সুপারিশ মালার সাথে একমত পোষন করেন এবং হালুয়াঘাট অঞ্চলের জন্য সেখানকার আদিবাসীদের বক্তব্যও প্রায় একই রকম পেয়েছেন ।

৩.৫ গারো সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রভাব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধঃ

শিক্ষাবিদ,দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তার On Education and Education & The Social Order গ্রন্থে তার শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ভাবনা তুলে ধরেন ।

উনিশ শতকের আগে শিক্ষাবিষয়ক দু'জন বড় সংস্কারক ছিলেন লক্ এবং রুশো ।তখনকার পদ্ধতি ছিলো-একজন শিশুর শিক্ষার জন্য কেবল একজন বয়স্ক ব্যক্তি সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকবেন ।এবং বনেদি সম্পদশালী পরিবার গুলোই কেবল তাদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে পারতেন।এই শিক্ষা পদ্ধতির অসারতা ব্যাখ্যা পূর্বক বার্ট্রান্ড রাসেল তার আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের আলোকে শিক্ষাকে সর্বজনীন করার তত্ত্ব প্রদান করেন। বার্ট্রান্ড রাসেলের আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের মূল উপাদান গুলো হলোঃ ক.আদুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক খ.এ শিক্ষা ব্যবস্থায় বালক-বালিকাদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ থাকবে গ. শিক্ষাব্যবস্থা হবে সর্বজনীন ঘ. এবং শিক্ষাকে আলঙ্কারিক করার চেয়ে প্রয়োজনীয় করার প্রবণতা ।

(শেখ মাসুদ কামাল, শিক্ষা প্রসঙ্গ(অনুবাদ),মূল বার্ট্রান্ড রাসেল,পৃঃ১৯/২০)

এ অধ্যায়ে বার্ট্রান্ড রাসেলের আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের আলোকে গারো সমাজের আধুনি শিক্ষার প্রভাব এবং মেলভিন সিম্যান এর Alienation (বিচ্ছিন্নতাবোধ) মডেলের নিচের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে গারো সমাজের বিচিছন্নতা বোধ বিশ্লেষণ করা হবে :

(ক) ক্ষমতাহীনতা (Powerlessness)

(খ) অর্থশূন্যতা (Meaninglessness)

(গ) আদর্শহীনতা (Normlessness)

(ঘ) সামাজিক বিচ্ছিন্নতা (Social isolation)

(ঙ) আত্ম বিচ্ছিন্নতা দশা (Self estrangement)

৩.৬ বিশ্লেষণঃ গারো সমাজে আধুনিক শিক্ষা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধঃ

আদিম সাম্যবাদী অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মধ্য দিয়ে এসে এ-যুগে ধনবাদী ঔপনিবেশিক শোষণ যন্ত্রের আওতায় নির্যাতিত হচ্ছে এই আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষগুলো। নিজেদের সমাজ কাঠামোর স্বাভাবিক বিকাশ না ঘটায় তাদের বস্তুগত ও ভাবগত সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটেনি। তারা তাদের আদিম সাম্যবাদী সমাজ হারিয়েছে, কিন্তু নিজেদের জন্য সামন্তবাদী বা ধনবাদী কোনো সমাজ-কাঠামোই গড়তে পারেনি,– সামন্তবাদ ও ধনবাদের শোষণটাই কেবল তাদের কপালে জুটেছে। খ্রিস্টান মিশনারি– সৌজন্যে গারোরা আধুনিক শিক্ষার কিছু স্পর্শ পেলেও সে শিক্ষা তাদের সমগ্র সমাজের জন্য কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনে না।

প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষা হয়ত অনেক ছেলে মেয়েই গ্রহণ করতে পেরেছে, কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় খুব কম সংখ্যক ছেলেমেয়েই। তাই, শিক্ষা তাদের ব্যাপক জন সমাজের জন্য আত্মিক সমৃদ্ধি বা বৈষয়িক স্বচ্ছলতা এনে দিতে পেরেছে– এমন কথা অবশ্যই বলা যাবে না।[বাবু রহমান,প্রতিভা রেমা (সম্পা.),গারো সমাজ ও সংস্কৃতি,পৃঃ১৯২)]।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত গারো ছাত্ররা অনুসন্ধান চালিয়ে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিত (বিভিন্ন বিষয়ে স্নতক ও স্নাতকোত্তর) ১৯৮৫ সালের ৬ ডিসেম্বরওএওযব উহষরংযঃবহবফ এধৎড়ং রহ ইধহমষধফবংয় নামের একটি পুস্তিকায় এতে দেখা যায়, ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন মাত্র ১৩৯ জন গারো তরুণ তরুণী। ১৯১০ সালে এদের সংখ্যা যদি দ্বিগুণেও দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলেও পৌনে এক লাখ বাংলাদেশী গারোর মধ্যে এ সংখ্যাটা কি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক কিছু ?

আদিবাসীদের মধ্যে খুবই কম সংখ্যক লোক যদিও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন, তবু এই সংখ্যালঘু শিক্ষিত মানুষের চিত্তলোক, স্বাভাবিক ভাবেই, এমন ধরণের ভাবগত সংকটের উদভব ঘটেছে যার অস্তিত্ব অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে নেই। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের সঙ্গে অপরিমেয় অশিক্ষিকদের এ ভাবেই বিচ্ছিন্নতা ঘটে, তাদের মধ্যে বস্তুগত ও চেতনাগত উভয় দিক থেকেই দূরত্বের সৃষ্টি হয়। শিক্ষা প্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে আত্মসচেতনতা জাগে। নানা কারণে যে সব জনগোষ্ঠী এযাবৎকাল অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ থাকতে বাধ্য হয়েছে, সে সব জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই বঞ্চিতের নিত্য ক্ষোভ বেশী মাত্রায় দেখা যায়।[বাবু রহমান,প্রতিভা রেমা (সম্পা.),গারো সমাজ ও সংস্কৃতি,পৃঃ১৯২)]

গারো আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটেছে। এমনিতেই কার্যকর শিক্ষা লাভের সুযোগ তাদের সীমিত, আবার শিক্ষিত হওয়ার পরও যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান হওয়া খুবই দুষ্কর। শিক্ষিত গারো নারী পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশই মিশনারি স্কুলের শিক্ষকতায় অথবা বিভিন্ন বেসরকারি সাহায্য সংস্থার (ঘএঙ) চাকুরীতে নিযুক্ত এর বাইরে অন্যত্র তাদের পদচারণার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। (নার্সিং পেশায় অবশ্যি গারো মেয়েদের অবস্থান বেশ উল্লেখযোগ্য।)

আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত আদিবাসীদের সমস্যা সংকট ও চিত্তক্ষোভ সাম্প্রতিক আদিবাসী সংস্কৃতিতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।ঊনিশ শতকের কলিকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যেও ঠিক একই রকম সংকট তথা সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়ে ছিল।

ঊনিশ শতকের মধ্যভাগের একজন শিক্ষিত বাঙ্গালি হিন্দুর চেয়ে এশতকের একজন শিক্ষিত গারোর মনোলোকের সংকট বরং অনেক বেশি গভীর। বাঙালি হিন্দু সমাজের অন্তত একটি অংশে মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল বৈষয়িক সচ্ছলতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, খণ্ডিতভাবে হলেও রেনেসাঁসের মতো একটি ঘটনার

সূত্রপাত হতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দেড় শো বছর পরও গারো সমাজে তেমন কিছুই ঘটেনি। অথচ এ সময়ে পৃথিবী কতো দূরেই না এগিয়ে গেছে। চারদিকের দ্রুত অগ্রসরমান পৃথিবীটাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে একজন শিক্ষিত আদিবাসী যখন তার একান্ত আপন পরিপার্শ্বের দিকে ফিরে তাকায় তখন তার নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ কী গভীর হয়েই না দেখা দেয় !

গারো সমাজের পুরুষদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ সঞ্চারিত হয়েছে অন্য আরও একটি দিক থেকে। গারোদের পরিবার প্রথায় মাতৃতান্ত্রিকতা আজো বহাল থাকায় বিয়ের পর ছেলেদের স্ত্রীর পরিবারে বাস করতে হয় এবং তারা থাকে সম্পত্তির অধিকার বঞ্চিত। এ বঞ্চনা তাদের কর্মবিমুখ এবং শিক্ষাবিমুখও করে তোলে। শিক্ষিত গারো নারীর জন্য প্রায়শই আপন সমাজে উপযুক্ত পাত্র মেলে না বলে তারা অনেকে ভিন্ন সমাজের পুরুষকে জীবন সঙ্গী করে নেয়, এবং এতেও আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্তদের একটি অংশ আপন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

আধুনিক শিক্ষা এভাবেও গারো সমাজকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ কয়ার বদলে বরং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাই ঘটাচ্ছে। অন্যদিকে আধুনিকতায় সঙ্গে প্রথাবদ্ধতার বৈপরীত্য প্রকট হয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি করছে। এক সময়কার সামাজিক অবস্থার যে ধরনের জীবনবোধ ও আচার আচরণ সঙ্গতি পূর্ণ ছিল, পরিবর্তিত অবস্থায় তা কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে– অথচ সে সব আচার বিশ্বাস অটুট রাখার পক্ষে সমাজের এক অংশের কিছু মানুষের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়, তারা যেন প্রবল শক্তিতে সমাজের চাকাটাকে পিছন দিকে টেনে রাখতে চান। আবার খ্রিস্ট্র ধর্মের পোড়া অনুসারীদের কেউ কেউ গারোদের ঐতিহ্যক জীবন ধারা থেকে পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটানোই একান্ত সঙ্গত বলে মনে করেন, তাঁরা যেন তাঁদের আবহমান কৃষ্টি সংস্কৃতির শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিতে চান। এই দুই চরমপন্থী মতবাদের সংঘাতও এখনকার গারো সমাজে প্রকট ভাবে দৃশ্যমান।

গারো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অনেকেই অমিতব্যয়িতা ও ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবের কথা বলে থাকেন। এমন কথা সম্ভবত সকল আদিবাসী সম্পর্কেই বলা চলে। তাদের আবহমান কালের আর্ত-সামাজিক পরিবেশ থেকেই এই মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটি তারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়েও এই মানিসক গড়নটিকে তারা পাল্টাতে পারেনি। একজন মনোবিজ্ঞানী লেখক লিখেছেন, – 'উদ্বৃত্ত উৎপাদন হলেও আদিবাসীরা সঞ্চয় বিমুখ। সঞ্চয়, মূলধন সংগ্রহ, লগ্নী ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক তাদের নেই বললেই চলে এ বিষয়ে তাঁরা অনাগ্রহী এবং তাঁদের কাছে মূল্যহীন। যে সব আদিবাসীরা লাঙল চাষ করেন, গো-পালন করেন, তাঁদের মধ্যেও সঞ্চয় স্পৃহা দেখা যায় না। আগামীদিনের কথা আদৌ চিন্তা করেন না যারা তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে এঁরা উৎপাদনের সবটাই প্রায় খরচ করে ফেলেন, নিজেদের অভাব মিটিয়ে অন্যদের দান করেন।... আদিবাসীদের কাউকে সঞ্চয় করতে দেখলে বা ঐভাবে সম্পত্তির অধিকারী হলে তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা মোটেই বাড়ে না বরং সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধাচরণের জন্য নিজের সমাজের সকলে তাঁকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। আধুনিক কালের আদিবাসীরা ভবিষ্যৎ দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করা, অপচয় হ্রাস করা, উৎপাদন বাড়ানোকে প্রয়োজনীয় মনে করলেও বর্তমানের উৎসব আনন্দ, তাৎক্ষণিক উপভোগ ও বর্তমানের প্রাপ্তির উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যবসা বাণিজ্যের দিকের একটু একটু করে ও তাঁদের নজর যাচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু যে মনোবৃত্তি থাকলে কেনা বেচা থেকে লাভ করা যায়, সে মনোবৃত্তি এখনো তাঁরা আয়ত্ত করতে পারেননি। ব্যবসায়ী মানসিকতার নৈর্ব্যক্তিকতা চুক্তি মেনে চলার প্রবণতা এখনো গড়ে ওঠেনি।'

গারোদের বিরুদ্ধে মধ্যপান ও নৃত্যগীতের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণের যে অভিযোগ আছে, সেটিও প্রায় সকল আদিবাসীর ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। এ ব্যাপারেও উপরি উক্ত মনোবিজ্ঞানী বলেন–

'... মনোরোগ চিকিৎসক নৃতত্ত্ববিদের ধারণা যে খাদ্য পানীয় যৌনাচার নৃত্যগীত ইত্যাদির মাধ্যমে আদিবাসীরা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অকৃত্রিম আনন্দ লাভ করতে অভ্যস্ত ।'

বর্তমানকাল অবধি গারোদের সমাজ কাঠামোর বাঞ্ছিত উর্ধ্বতন যেমন ঘটেনি, তেমনি তাদের মধ্যে এমন ব্যাপক আধুনিক শিক্ষারও প্রসার হয়নি যার ফলে সমগ্র সমাজে একটা নব চেতনার হাওয়া বয়ে যেতে পারে। তেমন হলে তাদের অভ্যস্ত অনেক সংস্কারের মূলেই ঘা পড়ত, মনোজগৎ তথা সংস্কৃতিতে একটা রেনেসাঁস সূচিত হত ।

কোনো জনগোষ্ঠীর রেনেসাঁস ঘটে তার ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে । পুনুজ্জীবন মানে অতীতে ঐতিহ্যের নবায়ন ।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসারে দিকে তাকালেই বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে ।

খ্রিস্টধর্ম সমগ্র ইউরোপের খণ্ড খণ্ড জনগোষ্ঠীর জন্য একটা ঐক্যসূত্র নিয়ে এসেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হয়েই যে ইউরোপীয়দের চিত্তের মুক্তি ঘটেছিল, এমন কথা বলা যাবে না । ইউরোপীয়া ঐতিহ্যবাহী গ্রিক সংস্কৃতির নতুন মূল্যায়ন করে তার উত্তরাধিকার বহন করেছে, এবং ঐতিহ্যের অনুবর্তনের বদলে নব মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই তাদের জীবনে এসেছে রেনেসাঁস দীপ্ত ইউরোপ খ্রিষ্টিয় ঐতিহ্যকেও পরিত্যাগ করেনি, বরং মুক্তবুদ্ধির আলোকে বিচার করে এবং গ্রহণ বর্জনের বাস্তব সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে, গ্রিসীয় ও খ্রিষ্টিয় উভয় ঐতিহ্যের ইতিবাচক উত্তরাধিকার দিয়েই নিজেদের সমৃদ্ধ করে নিয়েছে ।

বাংলাদেশের আদিবাসীদেরও সামাজিক সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য ইউরোপীয় দৃষ্টান্তটিকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে ।কালের শিক্ষিতক ও চিন্তাশীল আদিবাসীদের অনেকের মধ্যেই এ চেতনাটি জাগ্রত হয়েছে । গারো লেখক সুভাষ জেংচাম তাঁর একটি প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন—

'খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী কেতা গ্রহণ করা কি অনিবার্য ছিল? কিংবা আপন ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি, নৃত্যগীত, বাদ্য বাজনা প্রভৃতি বিসর্জন দেওয়াও কি অপরিহার্য ছিল? তা হয়ত ছিল না, কারণ খ্রিস্টান হলেই আপন সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে মানুষকে যে উৎখাত করতে হবে, এমন কোনো বাধ্য বাধ্যকতা নিশ্চয় থাকতে পারে না। তথাপি দেখা যায় গারোদের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রচলন অর্থাৎ যাকে আধুনিকীকরণ বলা হয় তা সম্পূর্ণ ভাবে এসেছে মিশনারি প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তবে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সংস্কৃতির কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। আমাদের মনে রাখতে হবে ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে গারো সমাজ যেন পূর্ব পুরুষের সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়।'

গারোরা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে কিন্তু ব্যাপকভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেনি বলে নতুন জীবন দৃষ্টি দিয়ে আপন ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন করাও এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

গারোরা যে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নবায়ন ঘটানোর সচেতনভাবে তৎপর হয়েছে তার প্রমাণ দেখি ১৯৮১ সালে বিরিশিরি উপজাতীয় কালচারাল একাডেমীর উদ্যোগে গারোদের প্রধান উৎসব 'ওয়ান গালা' পালনের মধ্যে। উপজাতীয় কালচারাল একাডেমীর পরিচালিকা বিভা সাংমার প্রস্তাবে–

'আসুন আমরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে বর্জন না করে নতুন আঙ্গিকে ধরে রাখার চেষ্টা করি। আপনি যদি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকেন সালজংকে পূজা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আপনি ঈশ্বরকে স্মরণ করে তাঁকেই ধন্যবাদ দিন। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে খাওয়া-দাওয়া, নাচ, গান, আমোদ আহ্লাদ এ সব তো সামাজিক ব্যাপার। আর মদের ব্যবহার? সে আপনার রুচির উপর নির্ভরশীল।

তবে যতোই বিশ্ব সংস্কৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন করা হোক না কেন, কোনো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে

কোনো সংস্কৃতির কথাই বলা যেতে পারে না। দেখতে হবে : বর্তমানে গারোদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি কি ? নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে কি তাদের সচেতন করে তোলা হয়? একজন গারো শিক্ষার্থী কি তার পাঠ্য বইয়ে আপন সমাজের বীরদের কোনো পরিচয় পেতে পারে? প্রশ্নগুলোর উত্তর যে খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়, সে তো আমরা জানিই। তাই এ ব্যাপারে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে না এলে উপজাতীয়দের শিক্ষা-সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো মনোহর বাণীচিত্র রচনা করাও সম্ভব হবে না।

শিক্ষার মাধ্যমে আদিবাসীদের আধুনিক জগৎ-ভাবণার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের আপন ঐতিহ্য সচেতন করার ব্যবস্থাও অবশ্যই থাকতে হবে। তাদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলছি না, তেমন ব্যবস্থা বরং মঙ্গলের বদলে অমঙ্গলই বয়ে আনবে। তবে, অন্তত মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তাদের জন্য বিশেষিত কিছু কিচু পাঠ্যসূচি রাখতেই হবে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও আদিবাসী জীবন ও সঙ্গে সমান তালে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ আবারিত করে না রাখতে পারলে সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য সমান কল্যাণ নিশ্চিত হবে না।

হালুয়াঘাটের আসকিপাড়া এবং আইলাতলী গ্রাম দুটিতে গবেষণা চালিয়ে গবেষক সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধের সবগুলো উপাদানই প্রত্যক্ষ করেন। সেখানকার শিক্ষিত গারোরা একবিংশ সতাব্দীতে এসে তাদের পূর্ব পূরুষদের ধর্মান্তরের ফলে যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে অর্থাৎ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি যেভাবে হারিয়ে গেছে তা যে মোটেও তাদের জন্য মঙ্গল জনক হয়নি সেটা অনুধাবন করে তাদের পূর্বের সংস্কৃতিকে চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছে যেটা মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতারই ইঙ্গিতবহ।এবং এটা বলা যেতেপারে আধুনিক শিক্ষা গ্রহনের ফলেই গারোদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং পূণর্ভজ্জীবনের ধারণা তৈরি হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

গারোদের আদি ধর্ম, ধর্মান্তর (খ্রিস্ট ধর্মে রূপান্তর) প্রক্রিয়ার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সম্পর্ক

চতুর্থ অধ্যায়

গারোদের আদি ধর্ম, ধর্মান্তর (খ্রিস্ট ধর্মে রূপান্তর) প্রক্রিয়ার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সম্পর্ক

গারোদের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে তাদের আদি ধর্ম, ধর্মান্তর প্রক্রিয়া এবং ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষার সম্পর্কঃ ওতোপ্রতোভাবে সম্পৃক্ত। গারো সমাজের ধর্মবোধ ও বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে তাদের আধ্যাত্মিক চেতনাবোধের পাশাপাশি তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সামগ্রিক বিকাশ সাধনে সহায়তা করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সময়ের সাথে সাথে গারো সমাজের ধর্মবোধ যা ধর্ম বিশ্বাসেরও নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে গারোরা তাদের অতীত ধর্মীও পরিচয় থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন ধর্মীয় পরিচয় গ্রহণ করেছে এবং সেখানে শিক্ষা একটি উপযোগ হিসেবে উপস্থিত। এই অধ্যায়ে গারোদের আদি ধর্ম, ধর্মান্তর এবং এর সাথে আধুনিক শিক্ষার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হবে। যা আমার গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্যের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

ধর্মের সমাজতত্ত্ব (The Sociology of Religion), সমাজে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে। ধর্মের সমাজতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ধর্ম দর্শন থেকে ভিন্ন। এমিল ডুরখেইমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা হচ্ছে 'ধর্মীয় জীবনের প্রাথমিক ধরন'। এখানে তিনি ধর্মকে সম্পূর্ণ একটি সামাজিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং আদিম ও সহজ-সরল ধর্মীয় প্রথা প্রতিষ্ঠান বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্ম সম্পর্কে এক সাধারণতত্ত্বে উপনীত হন। এ সম্পর্কে ডুরখেইমের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণ প্রথমত সমাজ বা গোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়। (কাজী তোবারক হোসেন, মুহাম্মদ হাসান ইমাম (সম্পাঃ), সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব, পৃঃ ২২৯)।

ম্যাক্স ওয়েবার ধর্মের অনুপূঙ্খ বিশ্লেষণ, বিশেষ করে তার আদিম রূপ, ধর্মের সাথে অর্থনৈতিক আচরণের কারণিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও বিশ্ব সম্পর্কে ধর্মীয় ধারণা ওয়েবারের ধর্ম সম্পর্কিত লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে। তার বিখ্যাত গ্রন্থ The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism-এ পুঁজিবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্টিজমের বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্ত্বিক ও অস্তিত্বমূলক সংশ্রবের ব্যাখ্যা জোরালোভাবে এসেছে। (কাজী তোবারক হোসেন, মুহাম্মদ হাসান ইমাম (সম্পাঃ), সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব, পৃঃ ২৪৩)।

মার্কস তার বিচ্ছিন্নতাবোধ (Theory of Alienation) তত্ত্বে উল্লেখ করেন, অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবোধ পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের প্রাত্যাহিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে। ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ ঘটে থাকে মানুষের চেতনায়, মানুষের আন্তর্নিহিত সত্তায়। (কাজী তোবারক হোসেন, মুহাম্মদ হাসান ইমাম (সম্পাঃ), সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব, পৃঃ ১৭৪)।

উত্তরাধুনিকতাবাদে (Postmodernism) সর্বজনীন ধর্ম এবং নৈতিকতাকে অস্বীকার করে ধর্মকে বলা হয়েছে একটি সাংস্কৃতিক রূপ যেটি একটি নির্দিষ্ট সমাজে, সময়ে এবং স্থানের প্রপঞ্চক। (ইন্টারনেট)

৪.১ গারোদের আদি ধর্মঃ

গারোদের আদি ধর্মের নাম সাংসারেক। বাংলাদেশী গারোদের ধর্মান্তরের কারণে তাদের পূর্বেকার আদি ধর্মটি বাস্তবিক অর্থে বিলুপ্তই প্রায়। কেননা বাংলাদেশের প্রায় ৯৮ ভাগ গারোই এমন খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত*। ধর্মান্তরিত হলেও গারোদের মধ্যে সাংসারেক ধর্মের সামাজিক দিকটি এখনও বর্তমান।

গারোদের প্রথাগত বিশ্বাস ও সংস্কারসর্বস্ব এই আদি ধর্মটি মূলত কৃষিভিত্তিক। মূর্তি পূজা, পাপ পুন্য, ভগবান, স্বর্গ-নরক ইত্যাদির কোনো ধারণা তাদের নেই। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ফসল সংরক্ষণ, রোগশোক মহামারী, ভূত প্রেত রাক্ষসী ইত্যাদি অদৃশ্য অপশক্তির অমঙ্গল থেকে বাঁচার জন্য তারা বারো মাসে তেরো কিংবা

ততোধিক ব্রত ও পর্ব পার্বণ পালন করে। (বাংলা পিডিয়া : ২০০৬)

Major A. Playfair তাঁর The Garos শীর্ষক পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে গারোদের আদি ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন :

"Like all animistic religions, that of the Garo consist's of the belief in a multitude of beneficent and malevolent spirits. To some is the attributed the creation of the world, of other the control of natural phenomena; and destinies of man from birth to death are governed by a host of divinities whose anger must be appealed by sacrifice and whose good offices must be entreated in manner."

অর্থাৎ, তিনি গারোদের ধর্মকে জড়োপাসনা যা ভূতপূজা বা প্রেতবাদ (Animism) বলে উল্লেখ করেছেন। গারোরাও অন্যান্য জড়োপাসনা কারীদের মতোই বহু উপদেবতায় বিশ্বাস করে, ঐ উপদেবতাগণের কারও কারও উপর জগতের সৃষ্টি আরোপিত হয়েছে, কারও কারও উপর প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আরোপিত হয়েছে। মেজর এ, প্লেফেয়ার (১৯০৯)

গারোদের আদি ধর্মকে অনেকেই জড়োপাসনা বলিয়া আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গারোদের আদিধর্মকে জড়োপাসনা বলা যায় না বরং সবদিক দিয়া বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্মমতের মতোই গারোদের আদি ধর্ম আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। (সুভাষ জেংচাম:১৯৯৪)আপাত দৃষ্টিতে যাহোক জাড়েপাসনা বলিয়া মনে হয় উহা আসলে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে উদ্ভুত জাগতিক সুখ সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কতিপয় আচার অনুষ্ঠান এবং পর্বত, নদী-নালা, পাথর প্রভৃতিকে দেবতা কিংবা শক্তির উৎস হিসেবে আরাধনা করে থাকেন, গারোরা কিন্তু ঐসবের আরাধনা সেইভাবে করেন না। প্রকৃতিকে যেইসব প্রবল শক্তির উপস্থিতি তাহারা গভীরভাবে অনুভব করে থাকে সেইসব প্রবল শক্তি সমূহকেই তারা দেব-দেবী জ্ঞানে গ্রহণ করেছেন এবং তাহাদের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশেই

পূজার্চনা করেছেন। সেইসব দেব-দেবীর কোন কোনটিকে তারা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছে, আবার কোন কোনটিকে রোগব্যাধির আঁধার একই সঙ্গে আরোগ্যদাতা হিসেবে কল্পনা করে রোগমুক্তির কামনায় তাদের উদ্দেশ্যে পূজা দিয়াছে, নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছে। সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, বজ্র, বৃষ্টি প্রভৃতির মধ্যে তারা প্রকৃতির প্রবল শক্তির উপস্থিতি অনুভব করেছে এবং সেই ভাবে তাদেরকে গ্রহণ করে আরাধনা করেছে। গারোরা একই সঙ্গে মানবদেহে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং সেই আত্মা যে অবিনশ্বর ইটাও বিশ্বাস করে। তারা জন্মান্তরবাদেও বিশ্বাসী। পৃথিবীতে বসবাসকালে যে যে রকম সৎকর্ম কিংবা পাপকর্ম করেছে সেই অনুপাতেই আত্মা পৃথিবীর বুকে বারংবার বিভিন্ন যোনীরূপে জন্মগ্রহণ করে থাকে। সেই জন্মগ্রহণ কখনো মানবরূপে কখনো মানবেতর প্রাণীরূপে আবার কখনো বা বৃক্ষলতারূপে হতে পারে। গারোদের বিশ্বাস এই জন্মান্তর গ্রহণের প্রস্তুতি পর্বে বিদেহী আত্মা সাময়িকভাবে চিকমাং পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণ করে। এই চিকমাং পাহাড়টি গারো পাহাড়ের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এবং বাংলাদেশের দুর্গাপুর, কলমাকান্দা প্রভৃতি এলাকা হতে এই পাহাড় স্পষ্ট দেখা যায়।(সুভাষ জেংচাম:১৯৯৪)

গারোদের বিশ্বাস, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিদেহী আত্মা প্রথমে চিকমাং পাহাড়ে গমন করে এবং সেখানে অবস্থারত ইতোমধ্যে মৃত তার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সাময়িক অবস্থান গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তাহার জাগতিক কর্মফলানুযায়ী সে মনুষ্য অথবা মনুষেত্বের কোন প্রাণি কিংবা বৃক্ষলতারূপে পৃথিবীর বুকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। আর বিদেহী আত্মা যদি পুতপবিত্র হয় তবে সে অজানা চিরশান্তিময় অনন্তলোকে যাত্রা করে। স্বর্গের সুখভোগ কিংবা নরকের শাস্তিভোগ সম্পর্কে গারোদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নাই। তবে পুতপত্রিব আত্মার চিরন্তন আবাসভূমি যে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে এবং উহ্য। নরকে যাতনা ভোগের মাধ্যমে পাপের অনন্ত শাস্তি সম্পর্কে গারোদের কোনো স্বচ্ছ ধারণা নাই। তবে তারা তাৎক্ষণিক শাস্তি যেমন, জন্তু জানোয়ারের হাতে অপ

মৃত্যুবরণ, কিংবা দুরারোগ্য কোনো ব্যাধি যেমন, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ায় বিশ্বাসী। সেই সঙ্গে জন্মান্তরে মানবেতর কোনো ঘৃণ্য প্রাণির দেহ পরিগ্রহণকেও গারোরা পাপের শাস্তি বলিয়া মনে করে। যেমন, কোনো ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে ঋণ পরিশোধ না করে যদি মারা যায় তবে সে কুকুর রূপে জন্মগ্রহণ করে ঋণদাতার গৃহে গোলামী খাটবে।

তাদের বিশ্বাস আদিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলময় ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। পরবর্তী সময়ে প্রধান দেবতা টাটারা রাবুগা তার সহচর নস্ত নপান্ত ও অন্যান্য দেব-দেবীর সহায়তায় পৃথিবী, আকাশ মণ্ডল, গৃহ-নক্ষত্র, সাগররাজি, পর্বতমালা, নানা জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। টাটারা-রাবুগা বিভিন্ন নামেও গারোদের নিকট পরিচিত। টাটারা-রাবুগা ছাড়াও গারোদের উপাস্য প্রধান প্রধান দেব-দেবীর তালিকায় রয়েছে, সালজং, চুরাবুদি, কালকামে গোয়েরা, আসিমা, দিংসিমা, টংরেমা, নাওয়াং, আল্লেমী, মেগাপাফিয়া, চুরাশী, আন্যিং, চাগব, চিগিচহাম, ওয়ালগাথ, জগু, সালবামন, উদুম প্রভৃতি। এইসব দেব-দেবীর কারও কারও দায়িত্ব মানুষকে বিষয় সম্পদে সৌভাগ্যশালী করা আবার কারও কারও কাজ মানুষকে নানাবিদ রোগ-ব্যাধি প্রদানের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা। যেমন–

১. সালজং

ইনি সূর্যবেদতার প্রতীক। ইনি মানব জাতিকে বিত্ত-সম্পদ প্রদান করেন, পৃথিবীকে ফুলে, ফলে, ফসলে ভরপুর করে তুলেন। পৃথিবীর বুকে নিয়মিত বর্ষণ ঝরানোও তার অন্যতম কাজ। গারোরা ক্ষেতের ফসল তোলার পরে সালজং দেবতার উদ্দেশ্যে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব ওয়ানগালা নিবেদন করে থাকে। সচরাচর এই ওয়ানগালা উৎসব অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

২. সুসিমে

ইনি চন্দ্র দেবতার প্রতীক। গারোরা অবশ্য তাকে দেবী হিসেবে মান্য করে থাকে এবং গারোদেয় বিশ্বাস ইনি অন্ধত্ব, পংগুত্ব,

বোবা-কালা প্রভৃতি জরা ব্যাধির কারণ। গারোরা তার সন্তুষ্টি বিধানে তার পূজায় একটি শূকর ও একটি মোরগ উৎসর্গ করে এবং সেই সঙ্গে নৈবেদ্য হিসেবে প্রচুর পরিমাণে মদ ব্যবহার করে।

৩. চুরাবুদি

ইনি সমুদয় শস্যের রক্ষাকর্তা। ক্ষেতের প্রথম ফসল তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হয়। কানে ব্যাথ্যা দেখা দিলে কিংবা ফেঁড়া উঠলে একটি মোরগ উৎসর্গের মাধ্যমে তার পূজা করতে হয়।

৪. কালকামে

মানুষসহ সমুদয় সৃষ্ট প্রাণির জীবনরক্ষা তার দায়িত্ব। মানুষ যাতে আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় পতিত না হয় এটা লক্ষ্য রাখাও তার দায়িত্ব। তার পূজায় একটি পাঠা কিংবা একটি মোরগ উৎসর্গ করতে হয়।

৫. গোয়েরা

ইনি ইন্দ্রদেবতার প্রতীক। এই দেবতার পূজায় একটি শূকর, একটি মোরগ অথবা হাঁস উৎসর্গ করতে হয়।

৬. আসিমা-দিংসিমা

ইনি দেবী সুসিমের মা। এই দেবীর নামোচ্চারণে গারোরা সযত্নে বিরত থাকেন, কেননা ইনি দুর্ভাগ্য এবং অমঙ্গলের প্রতীক।

৭. টংরেংমা

এই দেবীর কাজ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অসুস্থ করা। কোনো নদি কিংবা খালপাড়ে এই দেবীর পূজা সম্পন্ন করতে হয় এবং পূজায় একটি মোগর উৎসর্গ করতে হয়।

৮. নাওয়াং

ইনি একজন অপদেবতা। মৃত্যুর অব্যবহিত পারে বিদেহী আত্মা যখন পরপারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তখন এই অপদেবতা পথিমধ্যে ওৎ পাতিয়া থেকে আত্মাকে বিপথগামী করার প্রচেষ্টা

চালায়। সেই জন্যেই গারোরা মৃত ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে পয়সা-কড়িসহ নানাবিধ জিনিসপত্র উৎসর্গ করে, যাতে মৃত ব্যক্তির বিদেহী আত্মা পথিমধ্যে নাওয়াং কর্তৃক আক্রান্ত হলে ঐ সমস্ত পয়সা কড়ি ও জিনিসপত্র তার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মেরে নির্বিঘ্নে পালাতে পারে।

৯. আম্লেমী

ইনি সমুদয় দেব-দেবীর রানী। ইনি মানবদেহের ব্যথা বেদনা প্রভৃতি প্রদানের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করেন।

১০. মেগাপাফিয়া

ইনি হিন্দুদের ষষ্ঠী দেবীর প্রতীক। নবজাত শিশুর মঙ্গল কামনায় এই দেবীর পূজা করতে হয়। পূজার সময় শূকর উৎসর্গ করতে হয়। পূজার নৈবেদ্য হিসেবে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান চলে।

১১. চুরাশী

ইনি ছোট ছেলেমেয়েদের পেটে পীড়া জন্মাইয়া থাকেন। এই দেবতার পূজায় মোরগ উৎসর্গ করিতে হয়।

১২. আন্যিং

ইনিও ছোট ছেলেমেয়েদের অসুখ বিসুখের কারণ। এই দেবতার কুদৃষ্টি পড়লে ছেলেমেয়েদের অকালে চুলপড়ার অসুখ দেখা দেয়। এই দেবতার সন্তুষ্টিতে একটি শূকর কিংবা মোরগ উৎসর্গ করতে হয়।

১৩. চাগব

এই দেবতার নজর পড়িলে যে কোনো লোকের হাত পা খুব বেশি রকম ঘেমে শরীর সাংঘাতিক দুর্বল হয়ে পড়ে। তার পূজায় শূকর কিংবা মোরগ উৎসগ করতে হয়।

১৪. চিগিজ্ছান

ইনি মানুষকে হাতে পায়ে ব্যথাজনিত রোগ দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ বাতরোগের দেবতা। এই দেবতার পূজায় একটি ষাঁড় কিংবা শূকর উৎসর্গ করতে হয়।

১৫. ওয়ালগাথ

ইনি মানুষের সর্বাঙ্গে ব্যথা রোগ দিয়ে থাকেন। এই দেবতার পূজায় মোরগ উৎসর্গ করতে হয়।

১৬. জগু

এই দেবতার কাজ মানুষকে বুকে এবং পিঠে ব্যথা প্রদান করা। রোগী শ্বাসকষ্টে ভুগে মারা যেতে পারে। তার পূজায় মোরগ উৎসর্গ করতে হয়।

১৭. সালবামন

এই দেবতা রুষ্ট হইলে রোগী চোখের পীড়ায় কষ্ট পায় এমনকি রোগী অন্ধও হয়ে যেতে পারে। এই দেবতার পূজায় মোরগ উৎসর্গ করতে হয়।

১৮. উদুম

এই দেবতা রুষ্ট হইলে রোগীর পেটে সাংঘাতিক ব্যথা হয় এবং রোগী যন্ত্রণায় কাতরাইতে থাকে। এই দেবতার পূজায় কালো রঙের একটি পাঁঠা উৎসর্গ করতে হয়।

এই সমস্ত দেব-দেবী ছাড়াও গারোদের উপাস্য আরও অনেক দেব-দেবীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তবে সাধারণ গারোরা তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে খুব বেশি সজ্ঞান নহেন। সচরাচর অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা সমাজে যাহারা খামাল অর্থাৎ পুরোহিত হিসেবে গন্য তারাই এসব দেব-দেবরি অস্তিত্ব এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞাত। গারো সমাজে খামালদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এই খামালরাই বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন অসুখ বিসুখের কারণাদি নির্ণয় করেন, কোনো দেবতার কোপদৃষ্টিহেতু অসুখের উৎপত্তি তাও ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞাত হন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

খামাল কিন্তু ওঝা কিংবা কবিরাজ নন। দেব-দেবীর স্বপ্নদত্ত ক্ষমতাবলেই একজন খামাল মন্ত্রসিদ্ধ হন। স্বপ্নযোগেই তাকে উপাসনা মন্ত্র শিখানো হয় এবং সেই মন্ত্র নির্দিষ্ট কোনো একটি মন্ত্র নহে। প্রায় প্রতিটি দেব-দেবীর উপাসনায় বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র রয়েছে এবং একজন খাঁটি খামাল প্রতিটি দেব-দেবীর উপাসনা পরিচালনায় মন্ত্রসিদ্ধ। একজন নিরক্ষরপ্রায় ব্যক্তির পক্ষে এতগুলি মন্ত্র মনে রাখা এবং সময়ানুযায়ী প্রয়োগ করাও প্রায় এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অথচ একজন দক্ষ খামাল অবলীলাক্রমে তা করতে পারে। খামাল কিন্তু বংশানুক্রমে নহে। সমাজের যে কেহ নিজ যোগ্যতাবলে খামাল নিযুক্ত হতে পারে। তবে সাধারণত সদ গুণবালীর অধিকারী পূর্ণবয়স্ক পুরুষই দৈব প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খামাল পদে আসীন হন। একটি গ্রামে এক বা একাধিক খামাল থাকতে পারে, তবে এর জন্যে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। কারণ খামালগণ সমাজের যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে সম্পুর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই সেই ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত কাজ করে থাকেন। এর জন্যে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করতে পারেন না। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে লোকটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সামান্য যা কিছু উপহার দিবে তাই খামাল হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করবেন। সেই উপহার সামগ্রীর মধ্যে কিছু চাল ডালও থাকতে পারে, আবার কিছু মদ মাংসও থাকতে পারে। অতএব একজন খামাল কর্তৃক দায়িত্ব পালনকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবা বলা যেতে পারে। পূর্জা-পার্বন ছাড়াও গ্রামবাসির অসুখ বিসুখের সময় খামালকে ডাকা হয়। খামাল রোগী গৃহে উপনীত হয়ে বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে মন্ত্রপাত করে রোগ নির্ণয় করেন। গারো ভাষায় এই রোগ নির্ণয় পদ্ধতিকে সিমআ নিআ বলে। রোগ নির্ণয়ের পর খামাল উহার প্রতিবিধান নির্ধারণ করে দেন। বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনাও খামাল এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

৪.২ ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক :

গারো সম্প্রদায়ের আদি ধর্মের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং সেই সংস্কৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও সুসমৃদ্ধ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হতে শুরু করে প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সেই সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অসম্পূর্ণ। গারোদের আদি ধর্ম বিশ্বাসে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে নৃত্যগীত গারো সমাজে অপরিহার্য। তাদের নৃত্যগীতের শ্রেষ্ঠ উৎসব ওয়ানগালার অন্যতম প্রধান দেবতা সালজং পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তেমনি দরুয়া, কাথাদক আ, প্রভৃতি রিরিকধর্মী গীতির মধ্যেও নানা দেবদেবীর স্তবস্তুতি এবং সৃষ্টি রহস্যই প্রকাশ পেয়ে থাকে। কোনো উৎসবে কথায় কথায় আজিয়া কিংবা রে-রে পরিবেশন করা গারোদের চিরাচরিত স্বভাব। এসব আজিয়া, রে-রে প্রভৃতির কোনো কোনো অংশ স্থূল রুচির পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু তা গারোদের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গেও সমৃদ্ধ। অনেকের ধারণা গারোদের এই সংবদ্ধ সুসমৃদ্ধ সংস্কৃতি প্রাক বৌদ্ধ যুগের। তবে ধর্মান্তরের ফলে এই সংস্কৃতি লুপ্ত হতে চলেছে। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের ফলশ্রুতি হিসেবে গারোদের অনেকেই তাদের পোশাকে-আশাকে আহারে-বিহারে পশ্চিমী কেতা গ্রহণ করেছে। শিক্ষার উন্নতি হওয়ায় তাদের জীবন যাত্রার ধরন উন্নততর হয়েছে, প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ঔষধের শরণাপন্ন হয়েছে। সর্বোপরি ঐতিহ্যমণ্ডিত বৈচিত্র্যময় পোশাক-পরিচ্ছদ, নৃত্য-গীত, বাদ্য-বাজনা প্রভৃতি বিসর্জন দিতে বসেছে। অবশ্য শেষোক্ত ব্যাপারে গোঁড়া মিশনারিদের মনগড়া বিধি-নিষেধ কম দায়ী নয়।

৪.২ ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক :

গারো সম্প্রদায়ের আদি ধর্মের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং সেই সংস্কৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও সুসমৃদ্ধ । দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হতে শুরু করে প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সেই সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অসম্পূর্ণ । গারোদের আদি ধর্ম বিশ্বাসে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে নৃত্যগীত গারো সমাজে অপরিহার্য । তাদের নৃত্যগীতের শ্রেষ্ঠ উৎসব ওয়ানগালার অন্যতম প্রধান দেবতা সালজং পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । তেমনি দরুয়া, কাথাদক আ, প্রভৃতি রিরিকধর্মী গীতির মধ্যেও নানা দেবদেবীর স্তবস্তুতি এবং সৃষ্টি রহস্যই প্রকাশ পেয়ে থাকে । কোনো উৎসবে কথায় কথায় আজিয়া কিংবা রে-রে পরিবেশন করা গারোদের চিরাচরিত স্বভাব । এসব আজিয়া, রে-রে প্রভৃতির কোনো কোনো অংশ স্থুল রুচির পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু তা গারোদের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গেও সমৃদ্ধ । অনেকের ধারণা গারোদের এই সংবদ্ধ সুসমৃদ্ধ সংস্কৃতি প্রাক বৌদ্ধ যুগের । তবে ধর্মান্তরের ফলে এই সংস্কৃতি লুপ্ত হতে চলেছে । খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের ফলশ্রুতি হিসেবে গারোদের অনেকেই তাদের পোশাকে-আশাকে আহারে-বিহারে পশ্চিমী কেতা গ্রহণ করেছে । শিক্ষার উন্নতি হওয়ায় তাদের জীবন যাত্রার ধরন উন্নততর হয়েছে, প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ঔষধের শরণাপন্ন হয়েছে । সর্বোপরি ঐতিহ্যমণ্ডিত বৈচিত্র্যময় পোশাক-পরিচ্ছদ, নৃত্য-গীত, বাদ্য-বাজনা প্রভৃতি বিসর্জন দিতে বসেছে । অবশ্য শেষোক্ত ব্যাপারে গোঁড়া মিশনারিদের মনগড়া বিধি-নিষেধ কম দায়ী নয় ।

৪.৩ ধর্মান্তর প্রক্রিয়া, খ্রিস্টানমিশনারীয়দের কৌশল এবং গারোদের শিক্ষা গ্রহণ প্রয়াসঃ

গারোদের আদি ধর্ম আলোচনার পর দ্বিতীয় আলোচ্য হলো গারোদের ধর্মান্তর। এখন অধিকাংশ গারো যে ধর্মগ্রহণ করেছে তা হলো খ্রিস্ট ধর্ম। [রেভা : ক্লেমেন্ট রিছিল (২০০৬)]

খ্রিস্টান ধর্ম শিক্ষাকেই গারোদের ধর্মান্তরের কারন বলা হলেও এটা গবেষণায় দাবী রাখে যে এর ফলে ঐ সমাজে যে বিবর্তন ঘটেছে তা বিশ্লেষণ যোগ্য।মিশনারীয়রা গারোদের আদি ধর্মকে যেভাবে অসার প্রমাণ করেন তা হলো তারা গারোদেরকে বোঝান তাদের আদি ধর্মে বহু দেবতা ও উপদেবতা আছে, তাদের মধ্যে কিছু দেবদেবতা বিশ্বজগত ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঐ সৃষ্টি কাহিনীর মধ্যে বহু অসামঞ্জস্য ও বহু অযৌক্তিকতা রয়েছে। প্রথমত, তারা যদি দেবতা হয়ে থাকনে তবে কেন নস্তু-নপান্তু ও মাচি এই উপদেবতাদের সাহায্য নিতে হলো জগত সৃষ্টি করবার জন্য? এই উপদেতাগণও আবার কেন কাঁকড়ার সাহায্য গ্রহণ করলেন পৃথিবী গঠন করবার জন্য? কাঁকড়া সমুদ্রের তল থেকে মাটি এনে দিলে তবে উপদেবতাগণ পৃথিবী গঠন করলেন। প্রশ্ন হলো পৃথিবী সৃষ্টির আগে সমুদ্র ও মাটি এল কোথা থেকে? কাঁকড়াই বা এলো কোথা থেকে? সমুদ্র, মাটি ও কাঁকড়ার অস্তিত্ব কি পৃথিবীর অস্তিত্ব থেকে পৃথক কল্পনা করা যায়? আবার প্রশ্ন জাগে কাঁকড়ার আবির্ভাব কি অন্যান্য প্রাণীগুলোর পূর্বেই ঘটেছিল? এই ধরনের বহু অসামঞ্জস্য ও অযৌক্তিকতা গারো আদি ধর্মের শিক্ষার মধ্যে রয়েছে। যার ফলে ঐ শিক্ষা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।মিশণারীয়রা যৌক্তিকভাবে সহজে গারোদেরকে তাদের মতে টানতে পেরেছিল।'রেভা : ক্লেমেন্ট রিছিল (২০০৬)

অপরপক্ষে খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একজনই আছেন। তিনিই বিনা উপাদানে এই বিশ্বজগত এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির কাজ হলো সর্বশক্তিমত্তার কাজ। কোন সৃষ্ট জীব

তা করতে পারে না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তার মধ্যে শাশ্বতত জীবন রয়েছে, ঐ জীবন থেকে জীবন দিয়ে তিনি মানুষকে অমর করে সৃষ্টি করেছেন। তাই, মানুষের অন্তস্থলে নিহিত আছে অনন্ত সুখ ও অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভের উপায়ও নির্দেশ করছে খ্রিষ্ট ধর্ম। তা শিক্ষা দিচ্ছে যে, মানুষ যত দিন পৃথিবীতে থাকবে তাকে তার বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির সদ্ব্যবহার করতে হবে ঈশ্বরের গৌরব ও মানুষের সেবার কর্মে। মানুষের সেবার দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রমাণ করতে হবে, তার প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম পালন করতে হবে। তাহলে মানুষের আত্মা স্বর্গে যাবে। মৃত্যুর পরে, সেখানে অনন্ত সুখ ও অনন্ত জীবন ভোগ করবে। কিন্তু মানুষ যদি পৃথিবীতে থাকতে ঈশ্বরকে প্রেম ও সেবা না করে, অর্থাৎ মানুষকে প্রেম ও সেবা না করে, এই ভাবে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে, তবে তার জন্য রয়েছে নরক, নরকে গিয়ে সে অনন্ত কালের জন্য শাস্তি ভোগ করবে। রেভা ঃ ক্লেমেন্ট রিছিল (২০০৬)

মানুষকে অনন্ত সুখ ও অনন্ত জীবন দিতে চায় বলেই ঈশ্বর নিজ পুত্র যিশু খ্রিস্টকে এই জগতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যিনি ক্রুশারোপিত হলেন, দুঃখ ভোগ ও মৃত্যুবরণ করলেন, পুনরুত্থান করলেন, এইরূপে পাপ ও মৃত্যুর উপর জয়লাভ করলেন, মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করলেন, স্বর্গের পথ দেখিয়ে দিলেন। যিশু খ্রিষ্টে যে বিশ্বাস করবে সেই পরিত্রাণ পাবে, স্বর্গে যাবে। অনন্ত সুখ ও অনন্ত জীবন লাভ করবে। খ্রিষ্টের এই মহৎ শিক্ষা ও তার জীবন কাহিনী পবিত্র বাইবেলে লেখা রয়েছে এই বাইবেল গারো ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। এইভাবে যে মহৎ শিক্ষা গারোরো প্রচারকদের মুখে মুখে শুনেছে ও গারো ভাষার বাইবেলেও পাঠ করতে পেরেছে, তাতে তারা খ্রিষ্ট ধর্মে বিশ্বাস করেছে, দলে দলে খ্রিষ্টান হয়েছে। [রেভা ঃ ক্লেমেন্ট রিছিল (২০০৬)]

গারোরা কেন খ্রিষ্ট ধর্ম সহজে ও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে এই প্রশ্নের দ্বিতীয উত্তর হলো এই যে, মানুষের সেবাকর্মে খ্রিস্ট ধর্ম বিপুল প্রণোদণা ও প্ররোচণা দান করতে পারে। ধর্মের মূল্যায়ন

তার সেবা কর্মের দ্বারাই হয় সাধারণ মানুষের নিকট। খ্রিস্ট ধর্ম কি প্রকারের সেবাকর্ম এই দেশে গারোদের মধ্যে করেছে তা একটু তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

শিক্ষার বিস্তারের জন্যও খ্রিস্টান মিশনগুলি যা করেছে তার তুলনা হয় না। গারো ছেলেমেয়েরা যে স্কুলগুলিতে আজ পড়ছে ঐগুলি সমস্তই মিশনগুলি দ্বারা পরিচালিত। এই স্কুলগুলি না থাকালে গারোরা আজও অজ্ঞতার অন্ধকারে ঘুরে মরত।

এখানে মূল প্রতিপাদ্য যে বিষয়টি তাহলো, যে ধর্ম সেবা কর্মের দ্বারা প্রচারিত হয় তা মানুষের মন সহজে বুঝে ও গ্রহণ করে। সেবা ধর্ম ও প্রেম ধর্মের বাণীর মতো আর কোনো বাণী মানুষের হৃদয়কে অবলীলায় জয় করতে পারে না। খ্রিষ্ট ধর্ম তার সেবা ও প্রেম দ্বারা গারোদের সমস্ত হৃদয় মন জয় করে ফেলেছে। এটা হচ্ছে খ্রিস্টান মিশনারী সম্পর্কে গারোদের মূল্যায়ন যা গবেষক তার গবেষণা এলাকা হালুয়াঘাটের গারোদের কাছেও প্রশ্ন করে একই রকম উত্তর পেয়েছে।

শিক্ষাবিস্তার এবং মিশনারীয়দের কৌশলঃ

গারোদের পুঁথিগত শিক্ষা ইংরেজ রাজত্বের অবদান। সংঘাত বিক্ষুব্ধ সীমান্ত পরিদর্শনে এসে ইংরেজ কর্মচারীগণ গারোদের সাথে পরিচিত হন এবং তাদের মধ্যে পুঁথিগত শিক্ষাদান ও খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কুচবিহার তদানীন্তন কমিশনার মি. ডেভিড স্কট, যিনি পরে গারো অঞ্চলের জন্যে প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন (১৮১৬ সালে)। তিনি গারো নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শান্তি আলোচনা করে সর্বপ্রথম গারোদের শিক্ষার জন্যে সিংগিমারীতে স্কুল স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু গারো ছেলে মেয়ে না পাওয়ায় সে স্কুল আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮২৩ সালে মি. ডেভিড স্কটের মারা যাওয়ার পনেরো বিশ বছর পরে ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীদের উদ্যোগে দ্বিতীয়বার গোয়ালপাড়ায় স্কুল স্থাপন করে গারোদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রথম দিকে এ স্কুলেও গারো রেছলমেয়েরা

আসত না, অভিভাবকরা তাদের পাঠাত না। কারণ, গারোরা ইংরেজদের বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখত। তারপর একদিন কয়েকজন ব্রিটিশ কর্মচারী বালক ওমেদ ও রামখেকে গরু চরার মাঠ থেকে ধরে স্কুলে নিয়ে যান এবং তাদের ভালো ভালো খাবার, জামা কাপড় দিয়ে ছবি দেখিয়ে এবং আকারে ইঙ্গিতে ভাব বিনিময়ের চেষ্টা করেন। তারপর কিছু জিনিসপত্র দিয়ে তাদের বাড়িতে পাঠান এবং ইঙ্গিতে পরের দিনেও তাদের আসতে বলে দেন। তাদের অভিভাবকগণ এসব জেনে শুনে রেগে যায় এবং তাদের নানা প্রকার ইংরেজ ভীতি দেখিয়ে তাদের আস্তানায় যেতে নিষেধ করে। কিন্তু ফল হয় অন্যরকম। ঐ দুটি ছেলে পরের দিনেও গোপনে আরও কয়েকজন ছেলে সঙ্গে করে নিয়ে ইংরেজদের আস্তানায় এসে ভাব বিনিময় করে। এভাবে দিনে দিনে গারো ছেলেমেয়েদের ইংরেজদের আস্তানায় আসা যাওয়া সংখ্যা বেড়ে যায় এবং অভিভাবকদেরও ইংরেজদের উপর বিশ্বাস জন্মে যায়। ফলে স্কুল ভালোভাবে চলতে শুরু করে। এই ওমেদ এবং রামখেক দুই মামা-ভাগ্নেই ১৮৬৩ সালে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে গারোদের মধ্যে প্রথম খ্রিষ্টান হন।

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার গারোদের শিক্ষা ভার সম্পূর্ণরূপে মিশনারীয়দের হাতে ছেড়ে দেন। মিশনারীয়গণ গারোদের শিক্ষাক্ষেত্রে Downwaras filtration theory অনুসরণ করেন। তারা গারো যুবকদের Middles school ও Minor school পাশ করায়। গারো গ্রামে গ্রামে স্কুল করে তাদের শিক্ষক এবং প্রচারকরূপে নিযুক্ত করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেন ও গারোদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

কেস স্টাডি এবং তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায়

কেস স্টাডি এবং তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ

কেস স্টাডিঃ

কেস স্টাডি এক (গারো বা মান্দি) ঃ অনুপ দ্রং

নাম ঃ অনুপ দ্রং
বয়স ঃ ৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নবম শ্রেণী
পেশা ঃ অবসর প্রাপ্ত নায়েক
ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
সামাজিক অবস্থানঃ নকমা

অনুপ দ্রং কয়েক বৎসর পূর্বে সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন।পারিবারি আর্থিক অসংগতির জন্য বেশীদূর লেখা পড়া করতে পারেন নি। তার মতে আধুনিক শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা যে শিক্ষা মানুষের মনের দৃষ্টি খুলে দেয় এবং বাস্তবিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগে। অর্থাৎ তিনি আধুনিক শিক্ষা বলতে কার্যকর শিক্ষাকেই বুঝিয়েছেন। ঐ গ্রামে গারোদের মধ্যে তিনিই একমাত্র পুরুষ যিনি বিয়ে করেও ঘর জামাই না হয়ে বউ নিজের কাছে নিয়ে যান। অবশ্য সেটা সম্ভব হয়েছিল তার চাকুরীর সুবাধে। চাকুরি থেকে অবসর নিয়েও তিনি বউ নিয়ে তার নিজ গ্রামেই বাড়ি করে বসবাস করছেন। তর একছেলে এবং দুই মেয়ে। বড় মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে, ছেলে নবম শ্রেণীতে এবং ছোট মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে লেখাপড়া করছেন। তিনি তার ভাষায় ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। তিনি মাতৃ-প্রধান গারো সামাজিক কাঠামোর বাইরে নিজের নামে সম্পদ করেছেন। তার এবং স্ত্রীর নামে আলাদা ব্যাংক একাউন্ট আছে। ছেলে মেয়েরা বড় হলে তিনি তার সম্পদের সমান বন্টন ছেলে মেয়েদের মাধ্যে করে যাবেন বলে

ভাবছেন। আর পরিবারটি একটি অনু পরিবার এবং তিনি একজন আধুনিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ।

অনুপ দ্রং একজন রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান হিসেবে খ্রিস্ট ধর্ম মতের বিভিন্ন উৎসব ও পার্বণ পালন করেন পাশা পাশি গারোদের পুরনো সংস্কৃতির পুণর্দ্ধার এবং চর্চার ব্যাপারেও তিনি আগ্রহী। তিনি এবং তার পরিবার কয়েক বৎসর যাবৎ তার নিজ বাড়ি, গ্রামে এবং আসকিপড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত ওয়ান্না (ওয়ানগালা) উৎসব, গ্রামের সবাইকে নিয়ে তিনি উৎযাপন করেন। তার মতে খ্রিস্টানদের সামাজিক পরিবর্তন বিশেষ করে সমাজ কাঠামোর বেশ কিছু জায়গার পরিবর্তনের জন্য খ্রিস্ট ধর্ম সরাসরি দায়ী।

তার কাছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এই যে গারো সমাজের মাতৃ-তান্ত্রিকতা এবং খ্রিস্টীয় মতানুযায়ী পুরষতান্ত্রিক কতৃত্ব অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক এবং সামাজিক কাঠামো এটার জন্য কোন ধরনের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেন কিনা। তার উত্তর ছিলো হ্যাঁ বোধক।

এবং আরো তাকে প্রশ্ন করা হয়, যদি তিনি শিক্ষিত না হতেন তাহলে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা অনুভব করতেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেন তার গ্রামে সকল গারোই প্রায় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এবং ৮০/৯০ বৎসর বয়সী মান্দি মানুষ রয়েছে যারা ধর্মান্তরিত হলেও তাদের পূর্ব ধর্ম সাংসারেক-কে মানসিক ভাবে ধারণ করেন তবে তারা সেটা সে ভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে তার বক্তব্য হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা আধুনিক মনেরও পরিচায়ক। শিক্ষিত মন যে কোন বিষয় নিয়ে যৌক্তিক চিন্তা করতে সক্ষম। এবং বিচ্ছিন্ন বোধ একটি মানসিক ব্যাপার। গারোদের মধ্যে প্রায় সবাই একধরণের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেন।

কেস স্টাডি দুই (গারো বা মান্দি)

নাম ঃ নির্মল নক্রে

বয়স ঃ ৩৫

শিক্ষা ঃ বি,এ

পেশা ঃ এন. জি. ও কর্মী

বৈবাহিক অবস্থান ঃ বিবাহিত

ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক

গ্রাম ঃ আইলাতলী, হালুয়াঘাট ।

তার মতে গারোরা নিজেদেরকে মান্দি বলে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আদিবাসী ভাষায় মান্দি হচ্ছে মানুষ। তার পরিবারের কেউ-ই এখন সাংসারেক ধর্মের অনুসারী নয়, সকলেই ধর্মান্তরিত রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান ।

শিক্ষা সম্পর্কে তার বক্তব্য হলো বেঁচে থাকার জন্য তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তার স্ত্রী এবং দুই ছেলে নিয়ে শশুর বাড়িতেই অবস্থান করেন। তার স্ত্রীও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন তবে চাকুরী করেন না। আধুনিক শিক্ষা বলতে তিনি বাংলাদেশের মূল ধরার শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝেন ।

তার, সামাজিক মাতৃতান্ত্রিক নিয়মানুয়ী নিজেস্ব কোন স্থাবর সম্পত্তি নেই তবে নিজের নামে ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে।

তার কাছে প্রশ্ন ছিল খ্রিস্টান ধর্মের নিয়মকানুন গুলো তাদের মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক কিনা এবং যেহেতু তিনি তার ভাষায় একজন মধ্যস্তরের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণকারী মানুষ সেক্ষেত্রে ধর্মান্তর সম্পর্কে তার মতামত কি ।

তার উত্তর ছিল, খ্রিস্ট ধর্ম মত অনুযায়ী যেহেতু মাতৃতন্ত্রের কোন জায়গা নেই, সেক্ষেত্রে বিষয়টা প্রকাশ্যে না হলেও কিছুটাতো

সাংঘর্ষিক বলেন। তবে তারা কিছু ধর্মীয় শিথিলতার মধ্য দিয়েই খ্রিস্টান–ধর্মটা পালন করেন। ধর্মান্তর সম্পর্কে তার মতামত হলো, গারোদের নিজেস্ব যে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, প্রথা, নীতি–বোধ রয়েছে যে গুলোই মূলতঃ গারোদের (মান্দি) মূল পরিচয়ের সূত্র এবং গারোরা ধর্মীয় ভাবে দুই ধরনের পরিচয় বহন করে। প্রশ্ন ছিল গারোদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধে আধুনিক শিক্ষার প্রভাব নিয়ে। নির্মল নক্রে দাবী করেন বর্তমান সময়ে তাদের সম্প্রদায়ের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা অল্প শিক্ষিত, অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন কিংবা অশিক্ষিত গারোদেরকে তাদের পূর্ব সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে প্রতি বৎসর ওয়ান্না উৎসবের মাধ্যমে সকলকে একত্রিত করে তাদের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি চর্চার চেষ্টা করছে। যেহেতু তাদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাশা পাশি খ্রিস্টীয় পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথেও পরিচিত এবং চার্চে গিয়ে খ্রিস্টিয় কায়দায় উপাসনা এবং সেখানে ধর্মীও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সেহেতু দুই ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা এবং নিয়মকানুন তাদের সমাজে বিদ্ধমান। সেক্ষেত্রে মনস্তাত্বিক ভাবে একধরণে বিচ্ছিন্নতাবোধ তো তাদের মধ্যে আছেই।

কেস স্টাডি তিন (গারো বা মান্দি)

নামঃ টমাস মানকিন
বয়স ঃ ৩৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম, এস, এস (ঢা.বি)
পেশা ঃ বেসরকারী সংস্থার চাকুরী।
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
গ্রাম ঃ আইলাতলী, হালুয়াঘাট
ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক

টমাস মানকিন একজন উচ্চ শিক্ষিত, সদালাপি মান্দি। সেজন্য গবেষক সরাসরি তাকে তাদের ধর্মীয় পরিচয়, এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ এর সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন।

টমাস মানকিন খোলামেলা ভাষায় তাদের সম্প্রদায়ের অতীত এবং বর্তমানের ধর্মীয় বিষয়াদি, পট পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে কথা বলেন। যদিও তিনি বিয়ের পর বৌয়ের বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ এবং বৌয়ের পদবী ধারণ করেন তথাপি শিক্ষা গ্রহণ, পেশার সাথে সংশ্লিষ্টতা সহ নানা কারণে বাঙ্গালী পরিবার এবং সমাজের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা তার দৃষ্টি ভঙ্গিতে ভিন্নতা এনে দিয়েছে। তর বক্তব্য হচ্ছে স্থানীয় বাঙ্গালী দের সংস্পর্শ, খ্রিস্টান মিশনারীয়দের ধর্ম শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ইসলাম ধর্মের কিছু কিছু প্রভাব, গারোদের দৈহিক গঠন ব্যতিরিকে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনেক বেশী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আগের সেই যুথ বদ্ধ আদিম পাহাড়ি মান্দি জনগোষ্ঠী আজ প্রায় অচেনা একটি বিষয়। আধুনিক শিক্ষা বলতে টমাস মানকিন উন্নতর কারিগরি এবং দার্শনিক শিক্ষাকে বলেছেন। বাংলাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকলেও তিনি এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনেকটা আধুনিক শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নে তার উত্তর হলো সামাজ সব সময় পরিবর্তনশীল। উন্নতর সংস্কৃতি সব সময় অন্য সংস্কৃতিকে গ্রাস করে ফেলে। গারো বা মান্দি জনগোষ্ঠী এখন অনেক ক্ষেত্রে তাদের অনেক নিজস্বতাকে হারিয়ে ফেললেও বাংলাদেশের মূল ধারার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের পার্থক্য অনেক। মূল্যবোধ, সত্য কথা বলা, চুরি রাহাজানির অনুপস্থিতি গারো সমাজকে অন্যদের থেকে এখনো আলাদা করে রেখেছে। তিনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ অনুভব করেন এবং বিশ্বাস করেন তাদের পুরনো ঐতিহ্যগত বিষয়াদি যেমন ধর্ম, নৃত্য, গীত, লোক গীতি তাদের অনেক মূল্যবান সম্পদ। তারা তাদের মান্দি পরিচয়ে গর্ববোধ করেন। এখানেই তার ভাষায় আধুনিক শিক্ষার সার্থকতা এবং সর্ম্পক।

কেস স্টাডি চার (গারো বা মান্দি)

নামঃ সিমন ঘাগড়া

সিমন ঘাগড়া

শিক্ষা ঃ এইচ, এস, সি

বৈবাহিক অবস্থা ঃ অবিবাহিত

বয়স ঃ ২৬

গ্রাম ঃ আসকি পাড়া

ধর্ম জি, বি, সি (গাারো ব্যপ্টিস কনভেনশন)

সিমন ঘাগড়া একজন শিক্ষিত গারো যুবক। তার ভাষায় তার ধর্ম হলো জি, বি, সি (গারো কনভেনশন)। তারা সাধারণভাবে গির্জায় গিয়ে প্রার্থণা করেন। তাদের জি, বি, সি চার্চে কোন পেশাদার যাজক নেই। গ্রামের স্বেচ্ছা সেবকরা যাজকের ভূ-মিকা পালন করে অনেকটা সাংসারেক ধর্মের খামালদের মতো। পারিবারিক মাতৃতান্ত্রিকে প্রথার সাথে খ্রিস্টানদের পরিবার প্রথার অমিলের কথা বললেন তবে এটাও বলেন এতে করে তাদের মধ্যে তেমন কোন বিরোধ সাধারণত হয়না। পারিবারিক এবং সামাজিক নিয়ম কানুন অন্যান্য গারো পরিবার পরিবার গুলোর মতোই। তিনি তার পূর্বের সাংসারিক ধর্মের অনেক নিয়ম কানুনকে এখনও সঠিক বলে মনে করেন। সারা বৎসর তার পরিবার খ্রিস্টিয় বিভিন্ন উৎসব পালন করেন। তবে ইদানিং তারা ওয়ান্না উৎসব খুব ঘটা করেই পালন করেন এতে করে তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যগত বিষয়াদি উপলব্ধি করে থাকেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে গারোদের ধেনো মদ 'চু' পরিবেশনকে একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে অভিহিত করেন। তার মতে সাংসারেক ধর্মের বিভিন্ন পুজা পার্বনে চু পরিবেশন ছিল একটা স্থায়ী নিয়ম আমরাও এখনও ঐ নিয়মের বাইরে আসতে পারিনি।

শিক্ষা সম্পর্কে তার বক্তব্য হলো বর্তমানে তাদের প্রায়–সব ছেলে মেয়েই লেখা পড়া করে। গত একুশ বছর যাবৎ এই গ্রামে জি, বি,

সি পরিচালিত ব্যাপ্টিস স্কুলটিতে ধর্মীও শিক্ষা এবং মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

তিনি মনে করেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গরোদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে লালন করবে। তাদের পূর্ব পুরুষরা প্রথমদিকে ধর্মান্তরিত হতো অভাবের কারণে কিন্তু তারা অভাব থাকলেও মানসিক ভাবে এক এক জন গারো। গবেষক তার সাথে বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে কথা বলে তাদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার বৈশিষ্ট্য গুলোকে চিহ্নিত করেন। যা সিমন যাগড়াও তার মতো করে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেন।

কেস স্টাডি পাঁচ (গারো বা মান্দি)

নাম: মদন মাইকেল ধারী
বয়স ঃ ৯৮
পেশা ঃ কিছু করেন না।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নিরক্ষর
ধর্ম ঃ খ্রিস্টান ক্যাথলিক
গ্রাম ঃ আসকি পাড়া

বয়সের ভারে এখনও নুয়ে পড়েননি মদন মাইকেল ধারি, স্মৃতি শক্তি প্রখর। গবেষকের সাথে কথা বলতে বলতে স্মৃতি হাতড়িয়ে পুরনো দিনের অনেক কথাই বলছিলেন। শক্ত পুক্ত, লম্বা গড়নের মদন মাইকেল ধারি যৌবন কালে ফুটবল খেলতেন। তখনকার দিনে ভারত বর্ষেও বহু জায়গা তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। সাংসারেক ধর্মের পুরনো পুজা পার্বনের স্মৃতি কিছু কিছু বলতে পারলেন। দুই ছেলে ও এখন বয়স্ক মানুষ। ছেলেরা চার্চে কিছুটা লেখা পড়া শিখেছে। তিনি লেখা পড়া না জানলেও অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষিত মানুষের মতোই কথা বলেন।

তার মতে ধর্মান্তর একদিকে যেমন কিছু ক্ষতি করেছে অন্যদিকে লাভও হয়েছে। গারোদের ঐতিহ্যগত যে ধর্ম কেন্দ্রিক পুজা পার্বন

ছিল, সে গুলোতে প্রচুর আনন্দ ফুর্তি করতো গ্রামের মানুষেরা। তার ভাষ্যমতে তখনকার দিনে গারোদের খাওয়া পড়ার তেমন অভাব ছিলনা। সেজন্য যে কোন উৎসবই গারোরা দল বেধে আনন্দ করতো। আস্তে আস্তে গ্রামে নতুন মানুষের আগমন, সরল মান্দি মানুষকে বিভিন্ন ভাবে ঠকিয়ে বাঙ্গালীড়া তাদের জমি জমা দখলে নিয়ে গেল।

তবে তার আনন্দের জায়গা হলো এখনকার গারো সমাজ অর্থ নৈতিক ভাবে দরিদ্র হলেও তারা কিছু শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছে। তাদের সময় এতো শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ ছিলনা।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বোধের তিনি কোন মানে করতে পারেন না। তবে দুই রকম সামাজিক পরিবেশের তিনি পার্থক্য করতে পারনে। এটাও বললেন গারোদের আসল পরিচয় লুকিয়ে আছে তাদের পূর্বের সাংসারেক এবং কৃষি নির্ভর ধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে। এখনকার সময়ের ওয়ান্না উৎসব দেখে তিনি মন থেকে খুবই আনন্দ পান। আশা করেন গারোরা তাদের পুরনো হৃত রূপ ধিরে ধিরে ফিরে পাবেন।

শিক্ষা দীক্ষা শিখে তাদের সন্তানরা মানুষের মতো মানুষ হবে। সমাজের, ধর্মের উন্নতিতে (পালন) শিক্ষার স্থান সর্বাগ্রে বলেই তিনি মনে করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ

উত্তরদাতাদের শিক্ষার স্তর বিন্যাস

শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার। রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ। অন্তত দেড়শো বছর পূর্বে গারোরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে পরিচিত হন। খ্রিস্টান মিশনারীয়দেও হাত ধরেই এদেশের গারোরা প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার স্বাদ পায়। দিন দিন তাদের মধ্যে শিক্ষার হার বেড়েই চলেছে। নিজে গবেষনা এলাকার নির্ধারিত উত্তর দাতাদের শিক্ষায় স্তর বিন্যাস।

465120

সারনি নং –৫.১

উত্তরদাতাদের শিক্ষার স্তর বিন্যাস

শিক্ষায় স্তর	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সাক্ষর জ্ঞান	৪	১৩.৩৩%
পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত	৯	৩০%
মাধ্যমিক	৭	২৩.৩৩%
উচ্চ মাধ্যমিক	১	৩.৩৩%
স্নাতক	৭	২৩.৩৩%
স্নাতকোত্তর	২	৬.৬৬%
মোট	নাম্বার = ৩০	

উৎস ঃ মাঠ গবেষনা নভেম্বর ২০১০

সারনি ৫.১–এ– দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ ৩০% গারো পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করেছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩.৩৩% মাধ্যমিক স্তরে পাওয়া গেছে ২৩.৩৩% এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাওয়া গেছে ৬.৬%। উত্তর দাতাদের মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর প্রায় সকলেই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল শিক্ষকতা করে।

সারনি নং –৫.২

উত্তর দাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল স্কুলে শিশুদের ঝরে পরার কারণ এবং ঝড়ে পড়ার চিত্র।

গারোদের স্কুল থেকে ঝরে পাড়ার মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দৈন দশা। গারোদের ছেলে-মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাকে দায়ী করেন।

ঝড়ে পড়া	উত্তর দাতা সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৮	৬০%
না	১২	৪০%
মোট	নম্বর = ৩০	

তথ্য সূত্রঃ মাঠ গবেষণা নবেম্বর ২০১০

উত্তর দাতারা ছেলে-মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার কারণ হিসেবে ৬০ ভাগ উল্লেখ করেছেন আর্থিক অস্বচ্ছলতা কে। ৪০ ভাগ উত্তরদাতা অন্যান্য কারণের কথা বলেছেন।

সারনি নং –৫.৩

স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ার কারণ

গারোদেও নিজেদের এবং তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করতে না পারার একটি বড় কারণ হলো দরিদ্রতা। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ছাড়া আর কোন কোন কারণ ছেলে মেয়েদের ঝরে পড়ায় জন্য দায়ী উত্তর দাতাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল।

স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ার কারণ

কারণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
দরিদ্রতা	১৪	৪৬.৬৬%
ভাষা সমস্যা	৫	১৬.৬৬%
সামাজিক সমস্যা	১	৩.৩৩%
স্কুলের পরিবেশ	২	৬.৬৬%
সচেতনতার অভাব	৭	২৩.৩৩%
মোট	নম্বর = ৩০	

তথ্য সূত্রঃ মাঠ গবেষণা নবেম্বর ২০১০

উপরের সারনিতে দেখা যায় সর্বোচ্চ ৪৬.৬৬% উত্তর দাতা মনে করেন দরিদ্রতাই তাদের ছেলে ছেলেমেয়ের ঝরে পড়ার মূল কারণ। ১৬.৬৬ ভাগ ভাষাগত সমস্যা সামাজিক সমস্যার কথা বলেন ৩.৩৩%। স্কুলের পরিবেশের কথা বলেন ৬.৬৬% এবং অভিভাবকদের অসচেতনতার কথা বলেন ২৩.৩৩% উত্তর দাতা।

সারনি নং –৫.৪

ধর্ম সংক্রান্ত তথ্য

বর্তমানে শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ গারোই ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। আইলাতলী এবং আসকিপাড়ায় গবেষক একজনও সংসারেক ধর্মের অনুসারী পাননি।

ধর্ম সংক্রান্ত তথ্য

ধর্ম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সাংসারেক	০	১০০%
রোমান ক্যাথলিক	১৫	৫০%
প্রোটেস্ট্যান্ট	৫	১৬.৬৬%
জি, বি, সি	১০	৩৩.৩৩%
মোট	নম্বর = ৩০	

তথ্য সূত্রঃ মাঠ গবেষণা নবেম্বর ২০১০

আসকিপাড়া এবং আইলাতলী গ্রামের ৩০ জন উত্তর দাতার শতকরা ৫০% হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক, ১৬.৬৬% প্রোটেস্ট্যান্ট, এবং গারো ব্যাপ্টিস কনভেনশন হচ্ছে ৩৩.৩৩% ।

সারনি নং –৫.৫

ধর্মীয় উৎসব পালন

বছর জুড়েন গারোরা নানান ধরনের উৎসব পালন করে থাকেন। খ্রিস্টিয় উৎসবই মূলতঃ এখন তারা পালন করে। বর্তমানে তারা প্রতিবৎসর ওয়ান্না (ওয়ানগালা) উৎসবও পালন করছে।

ধর্মীয় উৎসব পালনের শতকরা হার

ধর্মীয় উৎসব	উত্তর দাতা	শতকরা হার
বড়দিন	৩০	১০০%
ইস্টার সানডে	২২	৭৩%
গুড ফ্রাইডে	১৫	৫০%
ওয়ান্না	২৪	৮০%
মোট	নম্বর = ৩০	

তথ্য সূত্রঃ মাঠ গবেষণা নবেম্বর ২০১০।

উপরের সারনিতে দেখা যায় শতকরা ১০০ ভাগ গারোই বড়দিন পালন করেন। ইস্টার সানডে পালন করে ৭৩ ভাগ, গুড ফ্রাইডে পালন করেন ৫০ ভাগ এবং ওয়ান্না উৎসবে যোগ দেন ৮০ ভাগ গারো।

সারনি নং –৫.৬

গারোদের অতি প্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস

শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত গারোদের মধ্যে অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পাওয়া যায়। নিচে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলোঃ

অতি প্রাকৃতে বিশ্বাসে গারোদের শতকরা

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস	উত্তর দাতা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৮	২৪.২৪%
না	২২	৭৩.৩৩%
মোট	নম্বর = ৩০	

তথ্য সূত্রঃ মাঠ গবেষণা নবেম্বর ২০১০।

উত্তর দাতাদের ৭৩.৩৩% এখন আর অতি প্রকৃতে বিশ্বাসী নন। ২৪.২৪% কম শিক্ষিত গারো এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতি প্রাকৃতে বিশ্বাস করেন।

সারনি-৫.৭

সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধ আছে কিনা

ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে গারোরা তাদের নিজস্ব অনেক সামাজিক রীতি-নীতি হারিয়ে ফেলেছেন। বর্তমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তাদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ আছে কি নেই গবেষক সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ

সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৭	৫৬.৬৬%
না	৫	১৬.৬৬%
বুঝতে পারিনা	৮	২৬.৬৬%
মোট	নম্বর = ৩০	

তথ্য সূত্রঃ মাঠ গবেষণা নবেম্বর ২০১০।

উল্লেখিত সারনিতে উত্তরদাতাদের ৫৬.৬৬% বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, ১৬.৬৬% সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নাই বলে উল্লেখ করেছেন। ২৬.৬৬% উত্তরদাতা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বোঝেন না বলে উল্লেখ করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফলাফল উপস্থাপনা ও উপসংহার

আদিবাসী গারো সমাজের ধর্মীয় পরিচয় এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ আধুনিক শিক্ষার সম্পর্ক নিরূপন করা হচ্ছে এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যয়টি একটি বিমূর্ত ধারণাকে প্রকাশ করে। এটি আসলে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে বুঝাতে সাহায্য করে। গারোরা একটি প্রাক্‌ সাম্যবাদী সমাজ থেকে ধীরে ধীরে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। তারা তাদের সামাজিক গঠন অনুযায়ী পূর্বে যুথবদ্ধভাবে পাহাড়ের গহীনে বসবাস করতো। তখনকার সামাজিক বাস্তবতা থেকে তারা ধীরে ধীরে পাহাড়ের পাদদেশের সমতল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তারও অনেক পরে উপনিবেশিক আমলে বৃটিশ শাসনের আওতাধীন আসে এবং খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মান্তরিত হয়। একই সাথে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষারও সূত্রপাত ঘটে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে গারোদের নিয়ে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা হয়েছে, বিশেষ করে মধুপুরের গারো সম্প্রদায়কে নিয়ে গবেষণায় দেখা যায়, সেগুলো বেশিরভাগই গারোদের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে। হালুয়াঘাটের গারোদের নিয়ে তেমন বিশেষ গবেষণাপত্র পাওয়া যায়নি। তবে প্রকাশিত সাহিত্য, প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র গবেষককে লিখতে এবং গারো সমাজকে বুঝতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। এ অধ্যায়ে মুলতঃ গবেষণার সারসংক্ষেপ এবং ফলাফল উপস্থাপন করা হবে। গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিকে অনুসরণ করে।

৬.১ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের গারো সমাজে ধর্মান্তর একটি বড় সামাজিক পরিবর্তনঃ

প্রাচীণ গারো নৃ-গোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র ধর্ম মতে বিশ্বাসী। তারা জড়বাদী এবং তাদের সনাতনী আদি ধর্মের নাম সাংসারেক। কিন্তু

বাংলাদেশের অধিকাংশ গারোই এখন খ্রিস্ট-ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। ফলে, তাদের প্রাচীণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব পড়েছে। তা সত্ত্বেও গারোরা খ্রিস্ট ধর্মের পাশাপাশি তাদের প্রাচীণ ঐতিহ্য মাতৃতন্ত্রকে বিসর্জন দেয়নি এবং তাদের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতিকে যথাসাধ্য সংরক্ষণ করে চলেছে। গারোরা স্বভাবের দিক দিয়ে অত্যন্ত শান্তি প্রিয় এবং তাদের স্বজাত্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। যে জন্যে তারা বরাবরই বিচ্ছিন্ন এলাকা বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকাকে বসবাসের জন্য বেছে নিতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের এই নিরূপদ্রব জীবন-যাপন মোটামুটি বহাল ছিল। কিন্তু উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম করার বেশ দীর্ঘ দিন পরে ব্রিটিশরা যখন গারো পাহাড় এলাকাকে তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনেন তখন থেকেই গারোদের ধর্মান্তর গ্রহণ শুরু হয়।

৬.২ ধর্মান্তরিত গারোরা তাদের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থেকে সরে এসে একটি মিশ্র খ্রিস্টিয় ব্যবস্থার গারো সমাজে প্রবেশ করেছেঃ

এটা অনস্বীকার্য যে, সময়ের সাথে সাথে গারো সমাজের ধর্মবোধ বা ধর্ম বিশ্বাসের নানান পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। খ্রিস্টান মিশনারীরা এদেশে গারোদের মধ্যে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া শুরু করে। ঊনিশ শতাব্দীর শেষার্ধে গারো পাহাড় এবং ময়মনসিংহ জেলার গারোদের মধ্যে ব্যাপকভাবে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার আরম্ভ হয়। এ কাজে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে বিশ শতকের গোড়ার দিকে ক্যাথলিক মিশনারীগণ ময়মনসিংহ জেলার গারোদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেন। ১৯২০ সালের পর তা ব্যাপকতা লাভ করে।

ধর্মান্তরিত গারো সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক দুটি ভাগ আছে। ধর্মীয় ভাগগুলি পরিবর্তিত হয়ে খ্রিস্টীয় অনুষ্ঠান হয়েছে, সামাজিক ভাগে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। যেমন, গারোদের বিবাহ ও অন্তেষ্টিক্রিয়ায় এ দুটোর মিশ্রণ দেখা যায়, বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় খ্রিস্টীয় রীতিতে এবং ভোজপর্ব অনুষ্ঠিত হয় সামাজিক আচার

পালনের মধ্য দিয়ে। অন্তোষ্টিক্রিয়ায় খ্রিস্টীয় রীতি পালন করা হয়। কিন্তু মৃতের ভস্ম এখনও দেলাং এর মধ্যে সংরক্ষণ করে। আবার গারোদের মাতৃতন্ত্রে খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব কিছু মাত্র কার্যকর হয়নি।

৬.৩ গারোদের ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি হয়ঃ

ব্রিটিশ শাসনের বহুকাল পূর্ব থেকেই এ উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম প্রভৃতির প্রচলন ছিল। কিন্তু সেগুলোর কোনটাই গারোদেরকে ধর্মান্তরে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। অন্যদিকে দরিদ্র গারোরা অতীত শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুযোগ পায়নি বললেই চলে। এমতাবস্থায় খ্রিস্টান মিশনারীরা গারোদের জীবন-যাপনের মান উন্নয়নের সাথে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। তারা গারো অঞ্চলের আনাচে কানাচে বিদ্যালয় স্থাপন করে নিরক্ষর গারোদের শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দেয়। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ধীরে ধীরে গারো সমাজ আজ নিরক্ষরতার আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। আইলাতলী এবং আসকিপাড়া গ্রামে এখন ৯৯ ভাগ গারোই অন্তত অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন এবং অনেকেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্নাতক রয়েছে, তাদের কেউ কেউ স্নাতকোত্তর স্তরও অতিক্রম করেছে।

৬.৪ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণকারী গারোদের চিত্তলোকে যে ভাবগত সংকট তৈরি হয়েছে সেটাকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়ঃ

আদিবাসী গারোদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোক যদিও আধুনিক শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে, তবুও এই সংখ্যালঘু শিক্ষিত মানুষের মনে, স্বাভাবিকভাবেই এমন ধরনের ভাবগত সংকটের উদ্ভব ঘটেছে অশিক্ষিত মানুষ যার অস্তিত্বকে অনুভব করলেও বা বুঝতে পারেন না। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের সঙ্গে অপরিমেয় অশিক্ষিতদের এভাবে বিচ্ছিন্নতা ঘটে, তাদের মধ্যে বস্তুগত ও

চেতনাগত উভয় দিক থেকেই দূরত্বের সৃষ্টি হয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে আত্মসচেতনতা জাগে।

গারো সামজে পুরষদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা যায় সম্পত্তির অধিকার বঞ্চিত হওয়ার কারণে। বর্তমান সময়ে কেউ কেউ বিশেষ করে শিক্ষিত গারোরা নিজেদের নামে সম্পত্তি করছে। তাদের নিজেদের নামে ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা রাখছে। আধুনিক শিক্ষা গারো সমাজকে সাংস্কৃতিকভাবেও সমৃদ্ধ করার বদলে বরং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাই ঘটাচ্ছে। এক সময়কার সামাজিক অবস্থার যে ধরনের জীবনবোধ ও আচার আচরণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, পরিবর্তিত অবস্থায় তা কার্যকারীতা হারিয়ে ফেলেছে। গারোদের ঐতিহ্যগত আচার বিশ্বাস অটুট রাখার পক্ষে সমাজের এক অংশের কিছু মানুষের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়, আবার অন্যদিকে কিছু মানুষ গারোদের ঐতিহ্যিক জীবনধারা থেকে পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটানোকে সঙ্গত মনে করছেন। এই দুই পন্থী মতবাদের সংঘাতও এখনকার গারো সমাজে প্রকটভাবে দৃশ্যমান।

পরিশিষ্ট-১

তথ্য দাতার পরিচিতি

গ্রাম: আসকি পাড়া, হালুয়াঘাট

১. কোহেলিকা রিছিল
   বয়স: ৩৫
   শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি
   ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

২. প্রকাশ রিছিল
   বয়স: ৪০
   শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণী
   ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৩. প্রহর রিছিল
   বয়স: ৪৮
   শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি
   ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৪. শংকর রিছিল
   বয়স: ৫০
   শিক্ষাগত যোগ্যতা: নবম শ্রেণী
   ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৫. রবার্ট ডিও
   বয়স: ২৫
   শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এ
   ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৬. শালগ্রা চাম্বুগং
   বয়স: ২৩
   শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এ
   ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৭. টুকি চাম্বুগং
   বয়স: ২২
   শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এ
   ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৮. খোকন রিছিল
   বয়স: ৩০

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.এ
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৯. মুক্তি রিসিল
বয়স: ৩৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

১০. রানা দ্রং
বয়স: ৩০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণী
ধর্ম: জি.বি.সি

১১. জয়রাম দ্রং
বয়স: ৬০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

১২. লকমুনি রিছিল
বয়স: ৭০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন
ধর্ম: জি.বি.সি

১৩. রাম দ্রং
বয়স: ৭৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

১৪. রঞ্জিত রেমা
বয়স: ৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.এ
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

১৫. যাত্রা চিশিম
বয়স: ৩৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

গ্রাম: আইলাতলী, হালুয়াঘাট

১. মিসেস দ্রং
বয়স: ৩৬

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এ
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

২. মিকসিম রিসিল
বয়স: ৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৩. প্রতিকা চিচামে
বয়স: ৩০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এ
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৪. বিবেক নন্দী
বয়স: ৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৫. আরমিকা রিসিল
বয়স: ৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: দশম শ্রেণী
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৬. সকাল দারী
বয়স: ৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রাইমারী
ধর্ম: প্রটেস্ট্যান্ট

৭. সিমুল রাংসা
বয়স: ৪৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৮. অনুভা দ্রং
বয়স: ৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

৯. ওয়েস্ট মানকিন
বয়স: ৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নবম
ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

১০. জগৎ মানকিন

বয়স: ৪০

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সপ্তম শ্রেণী

ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

১১. ব্বিপন্ন রিছিল

বয়স: ৪০

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এ

ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

১২. ক্ষঞ্চিরাম নন্দী

বয়স: ৫০

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন

ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

১৩. প্রোহেলি চিসিম

বয়স: ৩২

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.এ

ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

১৪. মেদেন সাংমা

বয়স: ৫০

শিক্ষাগত যোগ্যতা: তৃতীয় শ্রেণী

ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান

১৫. রাম সাংমা

বয়স: ৩৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন

১৬. ধর্ম: প্রোটেস্ট্যান্ট

পরিশিষ্ট-২

প্রশ্নমালা

১. ব্যক্তিগত তথ্যঃ

আপনার নাম কি?

আপনার বয়স কত?

আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা?

আপনার পেশা কি?

২. শিক্ষা বিষয়ক তথ্যঃ

আপনার গ্রামের শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কত হবে বলে আপনি মনে করেন?

এই গ্রামের সব গারো ছেলে-মেয়ে কি স্কুলে যায়? না গেলে তাদের ঝরে পড়ার কারণ বলবেন কি?

আধুনিক শিক্ষা বলতে কি বুঝেন?

গারো সমাজে আধুনিক শিক্ষার কি ধরণের প্রভাব আছে বলে আপনি মনে করেন?

ধর্ম শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার মধ্যে আপনি কি ধরণের পার্থক্য দেখেন?

৩. ধর্মান্ত সম্পর্কিত প্রশ্নঃ

আপনার সাংসারেক ধর্ম সম্পর্কে কি ধরণের ধরণা আছে?

আপনার মতে আপদি এবং বর্তমান ধর্মের ভালো দিক গুলো কি কি?

আপনি আদি ধর্মের কোন উৎসব পালন করেন কি? করলে কেন করেন?

আপনি কোন পরিচয়ের স্বাচ্ছন্ধ বোধ করেন, একজন গারো নাকি-খ্রিস্টান হিসেবে।

ধর্মান্তরের ফলে আপনার সামাজিক জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

৪. সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কিত প্রশ্ন:

আপনি আদি ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত গারো সমাজ আর বর্তমান খ্রিস্ট ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত গারে সমাজের মধ্যে কি ধরনের পার্থক্য আছে বলে মনে করেন?

আপনার মতে দুই ধরনের সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

আপনি এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেন কি?

এটা যদি এক ধরনের সামাজিক বিচ্ছিন্ন অনুভব করেন কিনা?

আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে অথবা প্রভাবে কি আপনি এ ধরনের বিচ্ছিন্ন অনুভব করেন?

গ্রন্থপঞ্জি

১. আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ-সামাজিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৯।

২. আলম, খুরশিদ, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, ঢাকা মিনার্ভা প্রেস, ১৯৯৩।

৩. সাত্তার, আবদুস, আরণ্য জনপদে (চতুর্থ সংস্করণ), নসাস, ২০০০।

৪. ইসলাম তরু, মাযহারুল (সম্পাদিত) গারো সম্প্রদায়ঃ সমাজ ও সংস্কৃতি, ঢাকা, আমানত প্রেস, ১১০০।

৫. কামাল শেখ মাসুদ-(অনুবাদ)-শিক্ষা প্রসঙ্গে॥ বার্ট্রান্ড রাসেল, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

৬. হোসেন, কাজী তোবারক ও অন্যান্য (সম্পাদিকা), সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্ব, ঢাকা, সালমানী প্রিন্টার্স, ২০০৫।

৭. মজিদ, মুস্তফা (সম্পাদিত)-গারো জাতিসত্তা, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬।

৮. রহমান, বাবু ও অন্যান্য (সম্পাদিত)- গারো সমাজ ও সংস্কৃতি, ঢাকা, গতিধারা, ২০০৯।

৯. গাইন, ফিলিপ (সম্পাদিত)- বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম, ঢাকা, দি ক্যাড সিস্টেম, ২০০৪।

১০. রাশেদা, এ.এন (সম্পাদিত), শিক্ষাবার্তা, ঢাকা, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ১৯৯৭।

11. I Ara, Chaman(2004), Bangladesh Garo Upojati, Hreddhi Prokashoni.

12. I Agar, M.H (1980), The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography, Academic Press, New York.

13. I Ali, Ahsan (1998), Santals of Bangladesh, ISRAA, Mindapur.West Bengal.

14. I Baldwin, C. D. (1934), God and the Garos, Australian Baptist Publication, House, Sydney.

15. Ball, Ellen (2000), Social Boundaries, Ethnic Categorization and the Garo People of Bangladesh, Utigeverij Eburon.

16. Ball, Ellen (1999), Manderangni: lmages of the Garos in Bangladesh, University Press Ltd (UPL), Dhaka.
17. Ball, Ellen (2007),Garo Ethnicity in Bangladesh, ISEAS.
18. Bhattacharjee, Jayanta Bhusan (1978), The Garos and the English 1765-1874, Radiant Publishers, New Delhi,
19. Bhattacharjee, Jayanta Bhusan(1984),Pattern of Economic Change in Garo Society, Omsons Publications, New Delhi.
20. Bahadul, MK. P (1970), Caste, Tribes, and Culture of India Assam.
21. Burling, Robbins (1997) The Strong Women of Modhupur, The University Press Ltd.
22. Burling, Robbins (1968) Rengsanggri Family and Kinship in Garo Village, Philadelphia University Of Pennsylvania Press
23. Burling, Robbins(1955) Hillman and Paddy Field, Prentice Hall Bal, E and Takame, Y. (1999)- Manderangni Jagring.- Images of the Garos & In Bangladesh. Dhaka University Press Ltd.
24. Barth, Fredrik (1969), Ethnic Groups and Boundaries, London, UK.
25. B enedict R, (1937), Patterns of culture, New York, America.
26. Burling, Robins (2004): "The Language of the Modhupur Mandi (Garo) vol-1, New Delhi.
27. Bhoumic, N'im-Chandra. Basu Dev Dhar,(1999), 'Adibashl Upajatoder Dabee Nae Shongoto
28. (Bengali) report, The Prothom Alo, 24.02.1999. Burling Robbins, (2005), The Mandis (Garos) of Bangladesh', in Earth Touch, Dhaka, No.9.

পাদটীকা

১. সরকারী হিসাবে বাংলাদেশে আদিবাসীর সংখ্যা ২৯টি।

২. আদিবাসী বলতে, বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের কথা বুঝানো হয়েছে।

৩. মজিদ, মুস্তফা (সম্পাদিত), ২০০৬। গারো জাতিসত্তা, পৃ. ৬৩।

৪. বাংলাদেশ ফোরাম, জাবারাং কল্যাণ (সম্পাদিত), প্রাথমিক শিক্ষা চিত্রঃ বাংলাদেশ আদিবাসী, ঢাকা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৪, পৃ. ৮।

৫. বাবু রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), ২০০৯। গারো সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃ. ৩২৬।

৬. দ্রং, সঞ্জীব (সম্পাদিত), ওয়ান্না, ২০০৩, পৃ. ১৮।

৭. মজিদ, মুস্তফা (সম্পাদিত)।

আলোকচিত্র

NNA 2010
aro Festival
19 November, Friday
Askipara, Mymensingh
ANNA

ওয়ান্না ২০১০ আসকিপাড়া হালুয়াঘাট

ওয়ান্না ২০১০-আসকিপাড়া, হালুয়াঘাট

ওয়ান্না ২০১০-আসকিপাড়া, হালুয়াঘাট

ওয়ান্না ২০১০-আসকিপাড়া, হালুয়াঘাট

গারো পরিবার, হালুয়াঘাট

গারো পরিবার, হালুয়াঘাট